প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ১১ ও ১২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ১ রবি. সানি, ১৪৩৭ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯৫ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ ঈসাব্দ

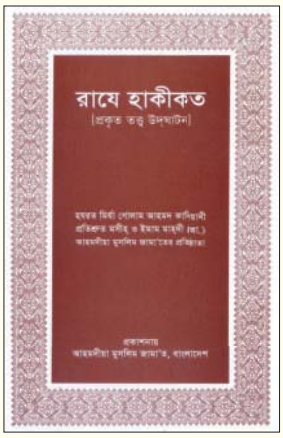

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'রাযে হাকীকত'** পুস্তকটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৮ সালে প্রণয়ন করেন।

এতে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের সঠিক ঘটনাবলী এবং ঘোষণাকৃত মুবাহালা সম্পর্কে কিছু হিতোপদেশ ও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত পুস্তিকাটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

সম্পাদকীয়

বিজয়ের মহান মাসে সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক
সুরক্ষিত হোক মানবতা
চির অম্লান থাকুক খাতামান নবীঈন (সা.)-এর মহান জীবনাদর্শ

মহান এ মাস ডিসেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই বেঁধে নিয়েছে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব আর বাঙ্গালী জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ ঐক্যের এক নিবিড় বন্ধনে। দীর্ঘ নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি। এর স্বাধীনতা চির অক্ষয় থাকুক এ কামনাই করি । বিজয়ের এই আনন্দঘন মাসে সমগ্র দেশবাসীকে আমরা জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এবারের ডিসেম্বর আমাদেরকে আরো সুসংবদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ ডিসেম্বর একই সাথে আমাদেরকে দু'টি আনন্দ দান করেছে। একদিকে আমাদের বিজয়ের আনন্দ অপর দিকে এই ডিসেম্বর মাস মিলে গিয়েছে বিশ্ব মানবতার মূর্ত প্রতীক বরং বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠাকারী মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম মাসের সাথে। অতএব এ ডিসেম্বর আমাদেরকে জাগতিক ও আত্মিক উভয় আনন্দে আপ্লুত করেছে। এ জন্য আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে দোয়া ও প্রত্যাশা রাখছি সত্যিকার ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আর মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত অনুসরণে আমরা আমাদের প্রিয় এ দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলারূপে গড়তে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ্!

বিজয়ের আনন্দের সাথে সাথে আমরা বুকে ধারণ করে আছিহানাদার বাহিনী ও উগ্র-মোল্লাদের নির্যাতনের সেই দু:সহ স্মৃতিচিহ্ন। তারা আমাদের নিরীহ স্বদেশবাসীদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, হরণ করেছেমা বোনের সম্ভ্রম, জ্ঞানী-গুণীজনদেরকে পরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে হত্যা করেছে, এ জন্য তাদের শত সহস্র ধিক্কার। বিজয়ের এ মাসে ব্যথাতুর হৃদয়ে স্মরণ করছি তাদের, যারা ঐসব হীন আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা নিগৃহীত নিপীড়িত সবাইকে তাঁর রহমতের চাঁদরে আচ্ছাদিত করুন। আমীন!

ধিক্ পাকিস্তানী মোল্লাদের!
ঈদে মিলাদুন্নবীর দিনেও মসজিদে হামলা!
মহানবী (সা.)-এর অবমাননা নয়তো আর কী?

বর্বর পাকিস্তানীরা ধর্মের নামে নির্যাতন-নিপীড়নের যে স্টিম-রোলার চালিয়েছে আমাদের ওপর, তা থেকে তাদের তথাকথিত ইসলাম জগতের বুকে খাঁটো করেছে মহানবী (সা.)-এর মহান ও প্রদীপ্ত জীবনাদর্শকে আর কালিমা লেপন করেছে অনিন্দ্য সুন্দর ধর্ম ইসলামের পবিত্রতায়। সুখের বিষয়, এদেরকে বাঙ্গালীরা হাড়ে হাড়ে চেনে। এদের নাগপাশ থেকে আমরা আজ মুক্ত, আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু ইসলামের এই চির শত্রুরা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় সদা তৎপর।

এরই এক প্রতিফলন ঘটিয়েছে একাত্তরের সেই প্রেতাত্তার দল গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ পাকিস্তানের চাকওয়াল জেলার দুলমিয়ালের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শত বছরের পুরনো মসজিদে হামলা চালিয়ে এবং অগ্নিসংযোগ করে। উগ্রধর্মান্ধ পাকিস্তানী মৌলবাদীরা ইসলামের বৈরী শাসক গোষ্ঠীর মদদে আহমদী মুসলমানদের ওপর ঐ একই কায়দার পৈশাচিকতা, সেই ১৯৫৩ থেকে আজো অব্যাহত রেখেছে। তাদের অপরিণামদর্শী ধৃষ্টতায় ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান নিজেই চরমভাবে আক্রান্ত। আক্রান্ত হচ্ছে, সে দেশের সুন্নি, শিয়া, ওহাবী, বেরেলভী, দেওবন্দী, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ....কে নয়? তবে লক্ষনীয় বিষয় হল, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অগ্রযাত্রাকে রুখতে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা, সামরিক শাসক জিয়াউল হকের সামরিক অধ্যাদেশ (ব্ল্যাক অর্ডিন্যন্স নামে আখ্যায়িত) জারী ইত্যাদি শত বাধাকে অতিক্রম করে আজ এই জামাত খিলাফতের ছত্রছায়ায় দুই শতাধিক দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষার প্রচার ও বিস্তারে তৎপর রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত সত্যান্বেষী মানুষ মানব-প্রকৃতি সম্মত ইসলামী জীবনাদর্শকে আলিঙ্গন করে চলেছে। সত্যের চিরশত্রুদের সহ্য হচ্ছে না বলেই এহেন বিদ্বেষের প্রকাশ তারা ঘটিয়েছে।

বাকী অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

সূচিপত্রে

১৫ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১০
(২৯তম কিস্তি)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১২
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ২৬
(৩য় কিস্তি)
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

হুযূর (আই.)-এর কানাডা সফর-২০১৬ ২৯
পর্ব-১
মুকাররম আব্দুল মাজেদ তাহের

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ৩৩
কল্যানময় তাহরীক তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী
মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

কলমের জিহাদ ৩৬
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

পাঠক কলাম– "ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব" ৩৮

সংবাদ ৪১

এমটিএ-তে প্রচারিত বাংলা সম্প্রচারের ৪৭
ডিসেম্বর মাসের সময়সূচী

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ
السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮০। তারা কি মধ্যাকাশে (ঊর্ধ্বে) ধরে রাখা পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেনি? একমাত্র আল্লাহ্‌ই এদের (ঊর্ধ্বে) ধরে রেখেছেন[১৫৬৭]। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا
تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ
اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا
وَاَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۸۱﴾

৮১। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য প্রশান্তি রেখেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশুর চামড়া থেকেও এক ধরনের গৃহ তৈরী করেছেন যেগুলো যাত্রাকালে ও অবস্থানকালে তোমরা সহজে (বহন করতে) পার। আর তিনি এদের পশম, লোম ও কেশকে এক নির্দিষ্ট সময় (পর্যন্ত ব্যবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুসমূহ (তৈরীর মাধ্যম করেছেন)।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ
لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ
سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ
تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২। আর আল্লাহ্‌ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়াদানকারী উপকরণ বানিয়েছেন, পাহাড়পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, তোমাদের জন্য এমন পরিধান সামগ্রী তৈরী করেছেন যা তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করে এবং এমন পরিধান সামগ্রীও (তৈরী করেছেন) যা যুদ্ধে তোমাদের সুরক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যেন তোমরা (তাঁর কাছে) আত্মসমর্পণ কর।

১৫৬৭। মক্কার কাফিরদের ওপরে আসন্ন আযাবের কথা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। "একমাত্র আল্লাহ্‌ই এদের (ঊর্ধ্বে) ধরে রেখেছেন" বাক্যটি দ্বারা তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত আযাব থেকে অবকাশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আরবী কবিতায় বহু ছন্দগাঁথা পাওয়া যায় যে বিজয়ীবাহিনীর পশ্চাতে পরিত্যক্ত পরাজিত শত্রুর মৃত দেহগুলোর ওপর পাখিরা ঝাঁপটিয়ে পড়ে খেতে থাকে। আরবী বাগ্‌ধারায় পাখিদের চক্রাকারে আকাশে ঘুরে বেড়ানো জাতির পরাজয় বা ধ্বংসের লক্ষণ বলে মনে করা হয় (৬৭ঃ২০)। এই আয়াতে ঘোষণা হয়েছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌ তা'লা বিরত রেখেছেন। কিন্তু যদি তাদেরকে একবার যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে কাফিররা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবে এবং আকাশে বিচরণকারী পাখিরা তাদের মৃতদেহগুলোকে ভক্ষণ করবে।

হাদীস শরীফ

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এক প্রদীপ্ত সূর্যরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করে রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্তা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তা'লা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দুরুদ।

কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে ইহজগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের ধারায় উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তা'লা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, সর্বপ্রথম যিনি জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দুরুদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, হাকীকাতুল ওহী, ১৪৪ পৃ.)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান্ নাবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তা'লার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেযা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে 'উম্মতি' বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলেই জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই বিশেষ এক গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-**'খাতামান্ নাবীঈন'**। এর এক অর্থ হচ্ছে-নবুওয়াতের সমস্ত পূর্ণতা, উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে নতুন শরীয়তওয়ালা আর কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই, যিনি তাঁর উম্মত-বহির্ভূত। বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত, তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা স্বতন্ত্র-নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ-মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্তত:পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ, যারা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য-ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য-চাকরের মতই মনে করেন এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী-আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি, তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, নেই কোন অন্ত। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদাদর্শনের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিস! এছাড়া, মোজেযা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি-না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী-সাহায্য। আমরা কী বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন-শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছেন'।

(চশমায়ে মারেফাত, পৃ. ৮-১০)

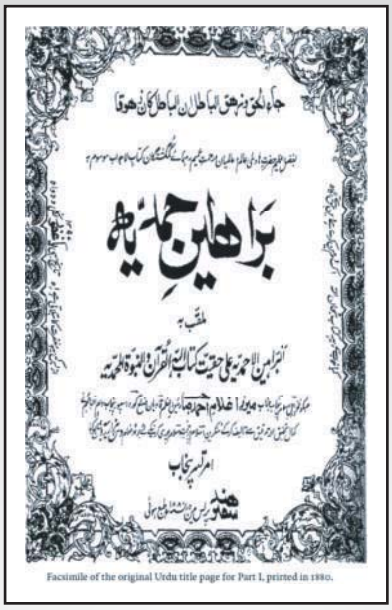

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২৬ তম কিস্তি)

দৃষ্টান্তস্বরূপ এর অনন্যতার একটি দিক হলো, কথা এত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ সাধারণ আকৃতির শব্দ বিন্যাসেও যদি এটিকে লেখা হয় তাহলে চার-পাঁচটি খন্ডে হয়ত তা সংকুলান সম্ভব। এছাড়া এতে সেসব ধর্মীয় সত্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অগোছালো ও বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী ও নবীদের সহিফায় দেখতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু এতে এই শ্রেষ্ঠত্বও বিদ্যমান যে, মানুষ পরিশ্রম, চেষ্টা ও সাধ্য-সাধনা করে ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধির বলে যাকিছু সত্য উদ্ঘাটন করে বা কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করে বা সেই জ্ঞান সম্পর্কে কোন প্রকার ভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব বা কোন প্রকার দলিল ও প্রমাণ নিজের যুক্তিশক্তি দ্বারা দাঁড় করায় বা এমনই কোন সূক্ষ্ম সত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপস্থাপন করে যা অতীত জ্ঞানীরা দীর্ঘকাল শ্রম ও সাধনার বলে আবিস্কার করেছেন অথবা অভ্যন্তরীন নৈরাজ্য ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি যতটা রয়েছে, যাতে বেশীর ভাগ মানুষ আক্রান্ত থাকে, এর কোনটির উল্লেখ বা চিকিৎসা যদি পবিত্র কুরআন থেকে উদঘাটন করতে চায় তাহলে সে যেভাবে এবং যেক্ষেত্রে পরীক্ষা করতে চায় পরীক্ষা করে দেখতে পারে।

সকল ধর্মীয় সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনায় পবিত্র কুরআন একটি বৃত্তের মত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কোন ধর্মীয় সত্য এর বাইরে নয়। বরং যেসব সত্যকে জ্ঞানীরা জ্ঞান ও বুদ্ধির অভাবে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করেছে পবিত্র কুরআন সেসবকে পূর্ণতা দেয় ও এর সংশোধন করে।

যেসব সূক্ষ্ম রহস্য কোন জ্ঞানী ও দার্শনিকের বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি, আর কোন মানব-মস্তিষ্ক যে সম্পর্কে ভাবতেও পারেনি, কুরআন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ও সততার সাথে তা বর্ণনা ও প্রকাশ করে। আর ঐশী জ্ঞানের সেসব সূক্ষ্ম দিক যা শত-শত পুস্তক-পুস্তিকা ও মোটা মোটা (বইতে) বই লেখা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণই রয়ে গেল, তা কুরআন পূর্ণাঙ্গীন রূপদানে লিপিবদ্ধ করেছে আর ভবিষ্যতে কোন বুদ্ধিমানের জন্য নতুন কোন বিষয় অবতারণার জায়গা খালি রাখে নাই। অথচ এটি এত ছোট একটি গ্রন্থ যা মধ্যাকৃতির অক্ষর-লিপিতে চল্লিশ পৃষ্ঠার অধিক হবে না।

এখন জানা কথা, এটি এমন এক প্রকার অনন্যতা যার সত্যতা সম্পর্কে একজন স্থূলবুদ্ধির মানুষও সন্দেহ করতে পারে না, কেননা সকল সুস্থ চিন্তার মানুষের সামনে স্পষ্ট যে, সকল প্রকার ধর্মীয় শ্বাশ্বত সত্য ও সমস্ত ঐশী সত্য এবং তত্ত্ব, সত্যনীতি সংক্রান্ত সকল যুক্তি-প্রমাণ, উপায়-উপকরণ আর পূর্বাপর সবার চিন্তাভাবনার নির্যাস একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে এমন পূর্ণতার সাথে পরিবেষ্টন করা, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন কোন সত্যের নামগন্ধও পাওয়া সম্ভব হয়নি, যা এর বাইরে রয়ে গেছে।

আর এটি মানুষের পক্ষে বানানো সাধ্যাতীত। এ কথাটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য সাক্ষর-নিরক্ষর প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে সোজা পথ খোলা রয়েছে। কেননা, এ বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে যে, পবিত্র কুরআন সকল ঐশী সত্য কীভাবে ধারণ বা পরিবেষ্টন করতে পারে, তাহলে আমরাই এই দায়িত্ব নিচ্ছি যে, কেউ সত্যসন্ধানী হিসেবে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন হিব্রু গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, সংস্কৃত ইত্যাদি গ্রন্থ (হতে) থেকে কিছুটা ধর্মীয় সত্য বের করে উপস্থাপন করুক বা নিজেরই বুদ্ধির জোরে কোন ঐশী নিগূঢ় সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা রচনা করে দেখাক, তাহলে আমরাও কুরআন থেকে তা বের করে দেখাবো; শর্ত হলো, এই গ্রন্থ প্রকাশকালেই আমাদের কাছে তা পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে উক্ত গ্রন্থের যথাযথ স্থানে টিকা হিসেবে আমাদের কথা সংযুক্ত হয়ে ছেপে যেতে পারে।

কিন্তু এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে এই শর্তও ভালভাবে স্মরণ থাকা উচিত, যে যে ব্যক্তি এই বিতর্কের সূচনাকারী, প্রথমে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কোন পত্রিকায় একথা ছাপিয়ে দিক যে, এই বিতর্ক শুধুমাত্র সত্য সন্ধানের উদ্দেশ্যেই সে করছে এবং নিজের প্রশ্নের পুরো উত্তর পেলে সে মুসলমান হতে প্রস্তুত। কেননা যার সত্য সন্ধানের মন-মানসিকতা বা সদিচ্ছা নেই আর যার হৃদয়ে খোদাভীতি নেই অথচ অন্তরের নোংরামির বশবর্তী হয়ে নৈরাজ্যবাদীদের ন্যায় আজে-বাজে কথাবার্তাই বলে বেড়ায়, তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা সময় নষ্ট করা বৈ-কী।

অনুরূপভাবে অনন্যতার আরও একটি কারণ রয়েছে আর তা সকল সত্য সন্ধানীর পক্ষে সহজেই বোধগম্য অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এতটা সংক্ষিপ্ত আর সত্য ও প্রজ্ঞাকে এমনভাবে আয়ত্ত করা সত্ত্বেও যার প্রথম কারণটির কথা আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। এর বাক্যবিন্যাস, বাগ্মিতা, ভারসাম্যতা, সূক্ষ্মতা, কোমলতা ও সতেজতা এবং ঔজ্জ্বল্য এমনভাবে সমৃদ্ধ যে, যদি ইসলামের ভয়াবহ বিরোধী আরবী রচনা ও প্রবন্ধ লেখায় পূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন, অত্যুৎসাহী কোন সমালোচকে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান শাসকের পক্ষ থেকে এই কঠোর হুঁশিয়ারি দেয়া হয় যে, তুমি যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ ২০ বছরের ভেতর যা একটি পরিণত বয়সকাল, কুরআনের সমকক্ষ এরূপ কোন নমুনা উপস্থাপন না কর অর্থাৎ কুরআনের কোন স্থান থেকে শুধু দু'চার লাইনের কোন বিষয় নিয়ে, এর সমান বা এর চেয়ে উত্তম কোন নতুন বাক্যগুচ্ছ রচনা করে নিয়ে না আস যাতে সেসব বিষয় নিজস্ব যাবতীয় সূক্ষ্মতা ও সত্যসহ বিদ্যমান থাকবে, আর বাক্যগুলোও হওয়া চাই কুরআনেরই ন্যায় প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ ; অন্যথায় ব্যর্থতার দায়ে তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। কিন্তু ভয়াবহ শত্রুও, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও মৃত্যুর আশংকা থাকলেও আর পৃথিবীর শত শত ভাষাবিদ এবং প্রাবন্ধিককে সাহায্যকারী হিসেবে সাথে নিলেও সে এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে আদৌ সক্ষম হবে না।

উপরোল্লিখিত এ দৃষ্টান্ত কাল্পনিক বা ধারণাপ্রসূত কোন কথা নয় বরং এটি সত্য ঘটনা যা কুরআনের যুগেই পরীক্ষা করা হয়েছে আর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এর সত্যতা সকল সত্য সন্ধানীর সামনে প্রমাণিত হয়ে এসেছে । এখনও যদি কোন সত্যসন্ধানী কুরআনের এই নিদর্শনকে স্বচক্ষে দেখতে চায় তাহলে আমরা অনায়াসে তার সামনে এই নিদর্শন প্রদর্শনের দায়িত্ব নিচ্ছি। অধিকন্তু এ বিষয়টি পরীক্ষা করা আর সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন কোন কাজ নয়। এমন কোন বিষয় নয় যাতে কিছু ব্যয় হয় বা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

সত্য সন্ধানীদের জন্য কেবল এটি আবশ্যক হবে, নিজের পছন্দ অনুসারে কুরআনের কোন স্থান থেকে কোন বিষয় নিয়ে কোন আরবী ভাষীকে, বর্তমানে যারা এদেশে লক্ষ লক্ষ

সংখ্যায় বিদ্যমান, এই উদ্দেশ্যে দেবে যাতে বিষয়টি এর মধ্যকার সমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও নিগুঢ় তত্ত্বসহ সে নিজের রচনায় সৃষ্টি করে দেখাতে পারে। অতএব এমন বিষয় প্রস্তুত হয়ে গেলে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। আমরা এই রচনা বা বাক্যাবলী কুরআনে-বিধৃত শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় যা অসার ও বঞ্চিত তা স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করবো, যে বর্ণনা প্রত্যেক উর্দুভাষী সহজেই বুঝতে সক্ষম হবে। এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যেভাবে অন্যান্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ যাচাই করা যায়, তদ্রুপ পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতা ও বাকশৈলিতে অনন্যতার যে বিশেষত্ব রয়েছে তা-ও পরীক্ষার মাধ্যমে অবগত হওয়া সম্ভব। খোদা তা'লা বস্তুর গুণাগুণ প্রকাশের জন্য এই রীতিই নির্ধারণ করেছেন যে, কোন বস্তুর বিশেষত্ব সম্পর্কে যদি সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে যতক্ষণ আত্মিক প্রশান্তি লাভ না হয় ততক্ষণ এ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

যে বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব কোন বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান তা সফলভাবে পরীক্ষা করার পরও যে ব্যক্তি সে বৈশিষ্ট্য কেন বা কী করে সেই বস্তুর ভেতর থাকতে পারে মর্মে সন্দেহ পোষণ করে, সেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই পাগল এবং উম্মাদ। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেছে আর বারংবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদ্ঘাটন করেছে যে, আর্সেনিক বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রাণহারী; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সে অজ্ঞানতার ভান করে আর্সেনিকের এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে বলে যে, আমি জানি না, এটি কীভাবে প্রাণহারী হতে পারে? তাহলে এমন ব্যক্তি বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে উম্মাদ বরং উম্মাদদের চেয়েও অধম বলে গণ্য হবে। কেননা প্রধানত এই সত্য নিজ গন্ডি ও পরিসীমায় একটি বাস্তব বিষয় যে, সৃষ্টিতে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং যেখানে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর বিশেষত্ব ক্রমাগত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিতও হয়ে গেল, সেখানে তা অস্বীকার করা যদি নির্বুদ্ধিতা ও উম্মাদনা না হয় তাহলে আর কী বলা যায়!

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সবিনয় নিবেদন

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, ইশায়াত (প্রকাশনা) বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জামাতের সদস্যদের জন্য ধার নিয়ে জামাতী বই-পুস্তক পড়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যেসব জামাতে লাইব্রেরী রয়েছে অথবা যেখানে লাইব্রেরী নেই তারাও আমাদের কাছ থেকে লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে বই নিতে পারবেন। আপনাদের আবেদনের ভিত্তিতে আমরা বই পাঠাব, ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত বইগুলিতে কার্ড হোল্ডার লাগানো থাকবে এবং কার্ডের একটি অংশে পাঠকদের নাম অন্তর্ভূক্তকরণেরও ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় জামাতের দায়িত্ব হবে কোন একজন দায়িত্ববান সদস্যকে একাজের জন্য নিযুক্ত করা যিনি পাঠকের বই গ্রহণের তারিখ এবং ফেরত দেবার তারিখ সেখানে লিপিবদ্ধ করবেন। এভাবে আপনারা নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পাঠ করতে পারবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইসহ জামাতের বিভিন্ন খলীফাদের বই, অন্যান্য লেখকদের বইও আপনারা এভাবে আনিয়ে নিয়ে জামাতের সদস্যদের মাঝে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন। এ মর্মে জামাতের সকল সদস্যদের নিকট সবিনয় আবেদন, আপনারা পুণ্য অর্জনের খাতিরে এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন কেননা আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর মাঝে একটি হল জ্ঞান অর্জন করা।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে বেশী বেশী ধর্মীয় বই-পুস্তক অধ্যয়ন করার সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

বিনীত নিবেদক
মাহবুব হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩০তম কিস্তি)

এখন এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, সমস্ত গবাদি পশুর জন্ম প্রজনন-প্রক্রিয়ায় হয়। কোনো ব্যক্তি ঘোড়া, গরু বা গাধা ইত্যাদি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে কখনও দেখে নি। অথচ এ স্থলে আক্ষরিকভাবে 'নুযুল' বা অবতরণ শব্দটি মওজুদ রয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি এ সব আয়াতের আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে না। অতএব এটি যখন জানা গেল যে, খোদা তা'লার কালামে এমন সব উপমা ও রূপক অর্থবোধক এবং ইশরা-ইঙ্গিতমূলক শব্দাবলী স্পষ্টাকারে বিদ্যমান রয়েছে আর তাই স্পষ্টত রূপক ভাষাতেই বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা লোহা, পোষাক ও গবাদি পশু অবতীর্ণ করেছেন, আর এ দ্বারা অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে। এতে করে স্পষ্টত ঐশী রীতি এমনটিই প্রতীয়মান যে, কোনো জিনিসের অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ অন্য কিছু (যেমন, সৃষ্টি করা) হয়ে থাকে। ইনসাফ (ন্যায় বিচার) করা আবশ্যক, হযরত মসীহ্‌র আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কথাটি কি লোহা এবং (গবাদি পশু ইত্যাদির অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত) এ আয়াতগুলোর চেয়ে বেশি স্পষ্টকারে বর্ণিত?! বরং হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কেবল কোনো কোনো হাদীস সূত্রে বিবেচিত এবং হাদীসগুলোও এমন যে, এগুলোতে 'আকাশে'র উল্লেখ নেই, কেবল 'অবতীর্ণ হওয়া' কথাটি লেখা আছে। কিন্তু গাধা ও গরু গবাদিপশুর অবতীর্ণ হওয়ার কথা কুরআন করীম স্বয়ং বর্ণনা করেছে। অতএব চিন্তা করে দেখুন, কোন্ দিকটি অগ্রাধিকার লাভের মর্যাদা রাখে? কেবল নাযেল বা অবতীর্ণ হওয়া বলায় যদি হযরত মসীহ্‌র আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী বলে মনে করা হয় তাহলে এথেকেও বেশি স্পষ্টাকারে বর্ণিত রয়েছে গবাদি পশুর অবতীর্ণ হওয়ার কথা।

কাজেই এ (আক্ষরিক) অর্থের ওপরই যদি ঈমান আনতে হয় তাহলে প্রথমে লোহা ও গবাদি পশু-গাধা ও গরুর ওপর এ মর্মে ঈমান আনুন যে এগুলো প্রকৃতপক্ষেই আকাশ থেকে অবতীর্ণ অথবা নিজেদের পশ্চদ্ধাবন এড়াবার জন্য এমনটি করুন যে, (পবিত্র আয়াতে বর্ণিত) 'আন্‌যালনা' (আমরা অবতীর্ণ করেছি) শব্দটিকে যা 'মাযী' তথা অতীতকাল সূচক ক্রিয়াপদে আছে এটি 'মুযারায় ইস্‌তিকবাল' তথা ভবিষ্যৎকাল সূচক ক্রিয়াপদ-এর অর্থে ধরে নিয়ে আয়াতটির এভাবে তফসীর করুন, 'আখেরী যুগে হযরত মসীহ্ যখন আকাশ থেকে নামবেন তখন একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা বহু সংখ্যক গাধা–বিশেষত বাহন হিসেবে ব্যবহার্য গাধা আর তেমনি অনেকগুলো গরু, ঘোড়া ও খচ্চর এবং লোহাও আকাশ থেকে অবতীর্ণ করবেন', যাতে করে আয়াত ও হাদীসসমূহের অর্থের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধিত হয়!! নইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই আপত্তি করার অধিকার রাখে, কুরআন করীমের আয়াতসমূহের অর্থ কেন 'জাহির' তথা বাহ্যিক বা আক্ষরিক দিক থেকে 'বাতিন' তথা রূপক অর্থের দিকে ঘোরানো হয়?

আর হাদীসসমূহে হযরত ঈসার অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে যে একই শব্দাবলী রয়েছে সেগুলোর বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থ সীমাতিরিক্ত বাড়িয়ে গ্রহণ করা হয়? অথচ জোরালো যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে হযরত মসীহ্ মাটির দেহ সহ কখনও আকাশে যান নি এবং আকাশ শব্দও আয়াতগুলোর কোথাও নেই। প্রথম আয়াতটি হলো **"ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া"** আর দ্বিতীয়টি হলো ঃ **"বর্‌-রাফা'আল্লাহু ইলাইহি**। এ দু'টিরই অর্থ হলো, খোদা তা'লা মসীহ্‌কে মৃত্যু দেওয়ার পর নিজের দিকে উঠিয়ে নেন। পুণ্যবান বান্দাগণ যখন মারা যান তাঁদের সম্পর্কেও যেমন সাধারণভাবে এটাই বলা হয় যে অমুক বুযূর্গ ব্যক্তিকে খোদা তা'লা নিজ সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। যেমন, "ইর্‌জিয়ী-ইলা রাব্বিক" (-'হে আল্লাহ্‌তে প্রশান্ত আত্মা! তুমি

তোমার প্রভুর দিকে চলে এসো')-আয়াতটি এদিকেই ইঙ্গিত করছে। খোদা তা'লা তো সর্বত্র বিরাজমান। খোদা তা'লা 'হাযির নাযির' তথা সর্বত্র সব সময় উপস্থিত ও সবকিছু দেখেন। তিনি পার্থিব ও শরীরি কোনো সত্তা নন। তাঁর কোনো নির্দিষ্ট দিকও নেই। তথাপি কোনো ব্যক্তিকে খোদা তা'লার দিকে ওঠানো হয়ে থাকলে তার সম্পর্কে কী করে বলা যেতে পারে যে নিশ্চয়ই তার দেহ আকাশে পৌঁছে গিয়ে থাকবে? এ কথাটি সত্য হতে সুদূর পরাহত। বস্তুত সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ আত্মিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খোদা তা'লার দিকে উন্নীত হয়ে থাকেন। তাঁদের মাংস ও হাড়গোড় কখনও খোদা তা'লার সকাশে পৌঁছায় না। তিনি নিজেই একটি আয়াতে বলেন ঃ **"লাইঁ ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়া লা দিমাউহা ওয়া লাকিইঁ ইয়ানালুহুত্ তাক্বওয়া মিনকুম।"** (আল্ হজ্জ ঃ ৩৮) অর্থাৎ কুরবানীর পশুর রক্ত ও মাংস খোদা তা'লার সকাশে কখনো পৌঁছে না। বরং তাঁর সকাশে সৎকর্মের রূহ বা নির্যাস 'তাক্বওয়া ও তাহারত' তথা খোদা-ভীতি ও পবিত্র চিত্ততা তোমাদের পক্ষ থেকে পৌঁছে থাকে।'

গোটা এ বর্ণনাটি থেকে একজন সত্যান্বেষীর জন্যে এ বিষয়ে পুরোপুরি স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে যে, কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসের যেখানে যেখানে কোনো জড়দেহধারী বস্তুর 'আকাশ থেকে' নামা বা নামানোর কথা লেখা আছে– হযরত মসীহ্ হোন বা অন্যান্য জড়বস্তু সে সব জায়গায় এসব শব্দ বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে কখনও গ্রহণ করা হয় না। কাজেই আমাদের উলমাও কেবলমাত্র হযরত মসীহ্কে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সব জায়গায় বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থেই গ্রহণ করে থাকেন। কেবল মাত্র হযরত মসীহ্র সম্পর্কেই তাঁদের মন-মস্তিষ্কে এমন জেদ ও উগ্রভাব আসন গেড়ে বসেছে যে তারা তাঁকে তাঁর জড়দেহসহ আকাশে পৌঁছান এবং পরবর্তী কোনো অজানা যুগে সেই দেহসহ আকাশ থেকে তাঁর নেমে আসায় তারা বিশ্বাস করেন।

খোদা তা'লা তাদের এহেন অবস্থায় দয়াপরবশ হোন, তারা আমাদের মনিব ও অভিভাবক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বোচ্চ এই মাকাম ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করেন না যে খোদা তা'লার কৃপা ও কল্যাণরাজী যদিও তাঁর প্রতিই সর্বাধিক ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৈহিক 'রাফ' সম্পর্কে অর্থাৎ তাঁকে দেহসহ মিরাজের রাতে আকাশে উঠানো হয়েছিল– এ সম্পর্কে প্রায় অধিকাংশ সাহাবা-কিরামের বিশ্বাস তেমনটিই ছিল যেমন হযরত মসীহ্কে আকাশে ওঠানোর সম্পর্কে এ যুগের মানুষ (সাধারণ ভাবে) বিশ্বাস পোষণ করে অর্থাৎ তাঁকে তাঁর দেহসহ ওঠানো হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁকে দেহ সহই নামানো হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সে-কথা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বীকার করেন নি। তিনি বরং বলেন এটি এক 'রুইয়া সালেহা' (সত্যস্বপ্ন) ছিল। আর এজন্য কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে নাউযুবিল্লাহ্ 'মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী) ও 'যাল্লাহ' (বিপথগামী) বলে আখ্যায়িত করেন নি এবং 'ইজমা'র পরিপন্থী কথা বলায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেন নি।

অতএব হে ন্যায় বিচারক ও ন্যায়পরায়ণগণ! হে সত্যান্বেষীগণ! হে খোদাভীরু বান্দাগণ! এ স্থলে একটু থামুন এবং ধীর-স্থীরে ও প্রজ্ঞার সাথে গভীরভাবে চিন্তা করুন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সশরীরে আকাশে ওঠা এবং আবার সশরীরে নেমে আসা কি এমন একটি আকিদা বা বিশ্বাস নয়– যাতে 'ইজমা' তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ সাহাবা কেরামের আস্থা ছিল এবং কয়েকজন যাঁরা এর বিপক্ষে অভিমত পোষণ করেছেন, কেউ তাঁদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেন নি? কেউ তাঁদের মুলহিদ, পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত বলে আখ্যা দেন নি।

এরপর এ-ও লক্ষ্য করা উচিত যে, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু.)-এর সশরীরে মে'রাজের ব্যাপারটিও হুবহু হযরত মসীহ্র সশরীরে আকাশে ওঠা ও আকাশ থেকে নেমে আসার মতো একটি সমদর্শী ব্যাপার। এমন একটি সাদৃশ্যমূলক ঘটনার বিষয়ে কতিপয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা কর্তৃক আমার রায় বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা প্রকারান্তরে আমার রায়েরই সমর্থন বটে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সশরীরে মে'রাজ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন প্রকৃতপক্ষে ও প্রকারান্তরে হযরত মসীহ্র কথিত দৈহিক 'রাফা' ও সশরীরে ঊর্ধ গমন সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনই বটে।

অতএব সকল এরূপ মু'মিন যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য, সম্মান ও মর্যাদাকে হযরত মসীহ্র সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে উন্নততর ও মহত্তর জ্ঞান করেন তাঁদের পক্ষে আদব ও শিষ্টাচারমূলক পদ্ধতি এটাই যে, তাঁরা যেন দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন, যে-ঐশী নৈকট্য ও মাহাত্ম্যের মাকাম ও মার্গ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য বৈধ নয় সেটি হযরত মসীহ্র জন্যও অবশ্যই বৈধ হবে না। কেননা যে-অবস্থায় মুসলমানদের সাধারণভাবে এ ধর্মমত ও বিশ্বাস রয়েছে যে, মসীহ্-ইবনে মরিয়ম আখেরী যুগে একজন উম্মতী হিসেবে আসবেন এবং তিনি 'মুক্তাদি' তথা অনুগমনকারী হবেন। 'মুক্তাদা' তথা অনুগমন ভাজন হবেন না অর্থাৎ নামাযে পেশ-ইমাম হবেন না।

অতএব এমতাবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, সেই ব্যক্তি যিনি পরিশেষে উম্মতি হয়ে আসবেন তার মর্যাদা সেই অপর ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে নিম্নতর হওয়াই আবশ্যকীয় যাঁকে উম্মতি হয়ে আগমনকারীর মনিব, পথপ্রদর্শক ও আনুগত্যভাজন নবী ও রসূল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের মনিব ও অভিভাবক রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আর বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার হবে যদি একজন উম্মতির

সেই সব প্রশংসা করা হয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয় যা তার পথপ্রদর্শক ও অভিভাবক রসূলের ক্ষেত্রে করা হয়নি এবং সেই মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এই উম্মতিকে দেওয়া হয় যা তার রসূলকে দেওয়া হয়নি!!

যদি বলেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে উম্মতি বলে কোথায় অভিহিত করা হয়েছে? তাহলে আমি বলি যে, সহীহ্ বুখারীর সেই হাদীসটি দেখুন যাতে বলা হয়েছেঃ 'ইমামুকুম মিনকুম' (অর্থাৎ তিনি তোমাদেরই মধ্যকার তোমাদের ইমাম তথা পথ-প্রদর্শক হবেন' –অনুবাদক)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উল্লেখিত 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্যকার) সর্বনামটির সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে সেই সমস্ত উম্মতি, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ হতে দুনিয়ার শেষকাল অবধি (সৃষ্টি) হতে থাকবে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, সম্বোধিত যখন কেবল উম্মতি এবং এই উম্মতিদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আগমনকারী ইবনে-মরিয়ম তোমাদেরই মধ্যকার হবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকেই পয়দা হবেন, তখন প্রকারান্তরে এ বাক্যটির এ অর্থই দাঁড়ায় যে, (এ উম্মতে) আগমনকারী ইব্‌নে মরিয়ম কোনো (স্বাধীন স্বতন্ত্র) নবী হবেন না। বরং তিনি হবেন উম্মতিদের মধ্যকার একজন।

এখন অনুধাবন করা আবশ্যক, এর চেয়ে অধিকতর জোরালো প্রমাণ এ বিষয়ে আর কী হতে পারে যে, 'ইবনে মরিয়ম' দ্বারা এস্থলে সেই নবীকে বোঝায় না যাঁর ওপর ইঞ্জিল নাযেল হয়েছিল। কেননা নবুওয়াত এমন এক নেয়ামত যা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। কেননা নবীকে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ নেয়ামত থেকে বিচ্যুত করা কখনও বৈধ ও বিধেয় নয়। যদি ধরা হয় যে, তিনি নবী হওয়ার অবস্থায় আসবেন এবং তিনি (আল্লাহ্ প্রদত্ত) তাঁর (স্বাধীন-স্বতন্ত্র) নবুওয়াতের মর্যাদাসহ নাযেল হবেন তাহলে মনে রাখতে হবে, 'খতমে নবুওত' এর পথে প্রতিবন্ধক। অতএব এটি এক জোরালো প্রমাণ বিশেষ। তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, এ গুঢ় তত্ত্বটি সে-ব্যক্তিই উপলব্ধি করবেন যাঁর হৃদয়ে খোদা-প্রদত্ত তাক্বওয়া ও বোঝার মতো সৎবুদ্ধি কাজ করবে।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

তাহরীক-ই-জাদীদ সংক্রান্ত বিশেষ নিবেদন

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) ১১ই নভেম্বর-২০১৬ কানাডা হতে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ৮৩তম বৎসরের ঘোষণা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমান যুগের আহমদীগণের চাঁদা আদায় মালী কুরবানীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন এবং যারা তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করেছেন তাদের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেছেন এবং তাদের রিযককে যেন আল্লাহ্ অনেক অনেক বরকত দান করেন তার জন্য দোয়াও করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষয় বিগত চার বছর যাবৎ আমরা আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.) এর দেয়া টার্গেট পূর্ণ করতে সক্ষম হই নি।

হুযূর (আই.) সকল আহমদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, জামাতের কেউই যাতে এই তাহরীক-ই-জাদীদ চাঁদার বাইরে না থাকেন। মনে রাখবেন নবজাতক থেকে বৃদ্ধ কাউকেই এর ফজিলত থেকে বঞ্চিত করবেন না। যে কোন পরিমাণই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। নওমোবাইনদেরও একই ভাবে শরীক করুন। মৃত পিতা-মাতা, দাদা-দাদী বা নিকট আত্মীয়-স্বজনের নামে এই চাঁদা দিয়ে তাদেরকেও জীবিত রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রত্যেক উপার্জশীল ব্যক্তিগণ তাদের মাসিক আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওয়াদা করা উচিত এবং ওয়াদা পূর্বের বছর থেকে বেশী হওয়া প্রয়োজন। উক্ত চাঁদা এখন থেকে প্রতি মাসে আদায় করবেন।

এই তাহরীক সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, **"আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই তাহ্‌রীককে পরিপূর্ণতার জন্য সোপর্দ করেছি। এ কাজ তাঁরই, আমি কেবল এক নগণ্য খাদেম। কথা আমার কিন্তু আদেশ তাঁর।"** (খুতবা জুমুআ ১৫, নভেম্বর; ১৯৩৫)

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২৫ জানুয়ারীর মধ্যে ২০১৬-১৭ সালের তাহরীক-ই-জাদীদ এর বাজেট তৈরী করে (নাম ও টাকার পরিমাণ সহ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে পাঠাবেন। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারী-২০১৭ ২য় সপ্তাহের মধ্যে বাজেট সম্বলিত রিপোর্ট হুযূর (আই.) এর নিকট পাঠাতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমগণের এবং অংগসংগঠনসমূহের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করবেন।

শহীদুল ইসলাম
সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন :
০১৭১৪০৮৫০৭০, ০১৭৩০০২৮৫৭৬
সেক্রেটারী ও সহ: সেক্রেটারী তাহরীক-ই-জাদীদ

জুমুআর খুতবা

প্রবীণ মুবাল্লেগ মুকার্‌রম বশীর আহমদ রফিক খান সাহেব এবং রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালের ডাক্তার মুকাররমা নূসরাত জাঁহা সাহেবা সেবকদ্বয়ের পরলোক গমনে পুণ্যময় স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব

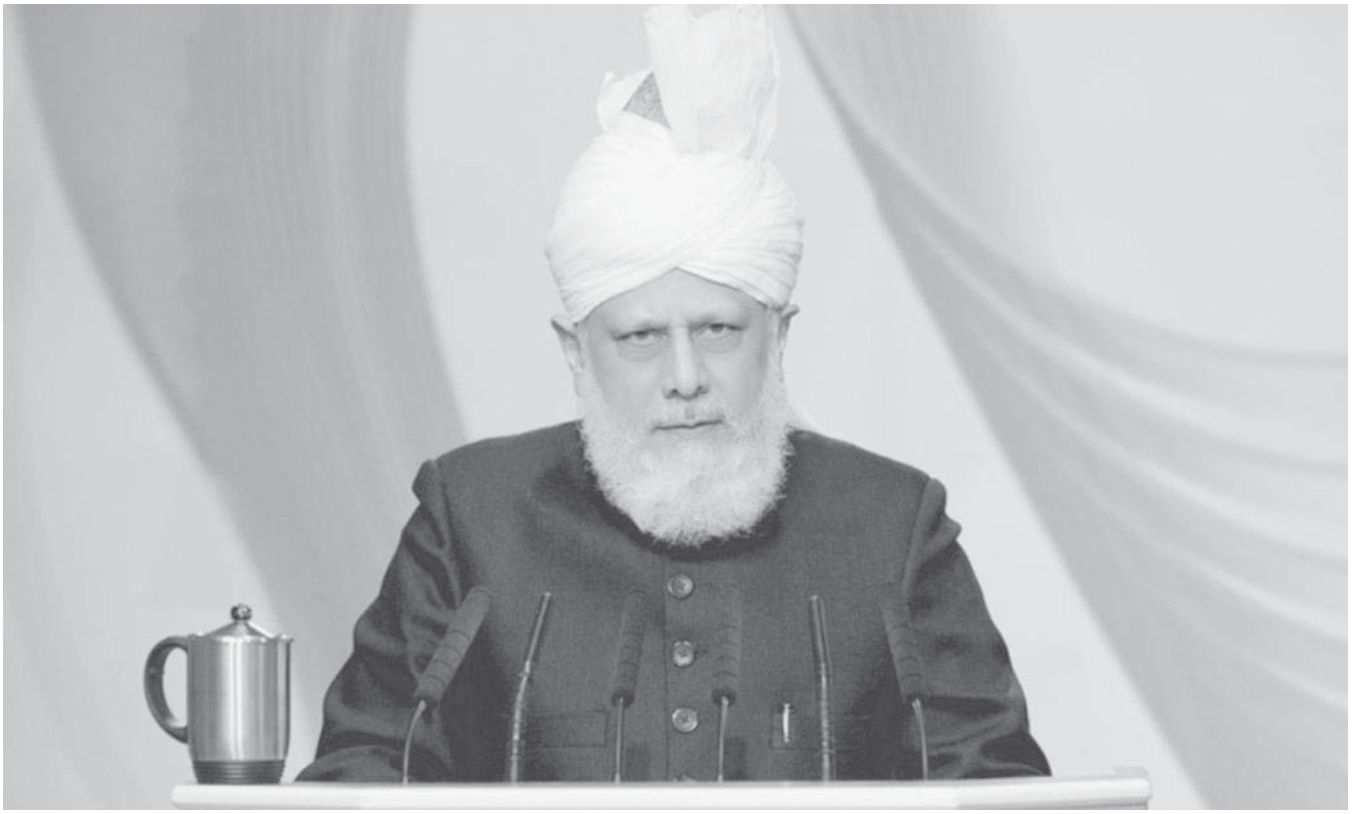

কানাডার টরন্টোস্থ বাইতুল ইসলাম মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ জামাতের দু'জন খাদেম বা সেবকের কথা আমি বলব সম্প্রতি যাদের ইন্তেকাল হয়েছে। তাদের একজন হলেন শ্রদ্ধেয় বশীর আহমদ রফীক খান সাহেব, আর অপর জন ফযলে ওমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগের চিকিৎসক ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা। যে ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে আসে তাকে ইহজগৎ থেকে একদিন বিদায় নিতেই হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মসেবার তৌফিক দান করেন আর মানবতার সেবা করারও সুযোগ প্রদান করেন।

বশীর আহমদ রফীক খান সাহেব দীর্ঘদিন জামাতের সেবক এবং মুবাল্লিগ ছিলেন, এছাড়া প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্বেও তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খুবই সুচারুভাবে তিনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৬ সনের ১১ই অক্টোবর প্রায় ৮৫ বছর বয়সে লন্ডনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি

ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে ১৯৫৮ সনে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পুরোনো আহমদী পরিবারের সদস্য। তার মায়ের নাম ফাতেমা বিবি যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াস খান সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। উনার পিতার নাম ছিল দানেশমন্দ খান সাহেব। ১৮৯০ এর কাছাকাছি সময়ে তার জন্ম হয়। তিনি দিব্যদর্শন এবং সত্য-স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

বশীর রফীক খান সাহেব জন্মসূত্রে আহমদী। তার পিতা ১৯২১ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। একারণে গ্রামবাসীরা তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বশীর রফীক খান সাহেবকে তার পিতা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, আপনার পত্র সবসময় আপনার পুণ্যবান পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর তার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। কথা এবং কাজের স্ববিরোধিতা থেকে তিনি পবিত্র এবং নিষ্ঠা ও সত্যতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এই হলো সেই বৈশিষ্ট্য যা এক মু'মিন এবং আহমদীর মহিমা-প্রকাশক। তিনি আরো লিখেন, তার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং রয়েছে, আর এর বহিঃপ্রকাশও সবসময় ঘটে দোয়ারূপে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে রহমতে সিক্ত করুন, আর তার সন্তান-সন্ততিকে সত্যিকার অর্থে তার উত্তরাধিকারী করুন। ১৯৫৬ সনে সেলীমা নাঈ সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয় যিনি আব্দুর রহমান খান সাহেবের কন্যা ছিলেন, আর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী খান আমীরুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তাদের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রয়েছে।

১৯৪৫ সালে রফিক খান সাহেব কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলে ভর্তি হন। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর। সে যুগে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক খুতবায় আহমদী যুবকদের জীবন উৎসর্গ করার তাহরীক করেন। এতে জুমুআর নামায শেষ হতেই এ তাহরীকে অংশ নিতে বেশ কিছু সংখ্যক যুবক নিজেদের নাম পেশ করে। আর এসব সৌভাগ্যশালী যুবকদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে যুগে আজকের মত ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ বা যথাযথ ছিল না। যাহোক তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ব্যক্তিগত পত্র প্রাপ্ত হন যে, আপনার ওয়াক্‌ফ গৃহিত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যতদিন দেশ বিভক্ত হয়নি তিনি কাদিয়ানেই পড়ালেখা অব্যাহত রাখেন। মেট্রিক বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অথবা দেশ বিভাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি নিজ পৈত্রিক অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর হঠাৎ একদিন প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের পত্র পাই যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, কাদিয়ানে এক পাঠান ছাত্র ছিল যে জীবন উৎসর্গ করেছিল কিন্তু তার নাম মনে নেই যে, সে কে ছিল। আর দেশ বিভাগের কারণে রেকর্ডও হারিয়ে গেছে বা রাবওয়ায় রেকর্ড ছিল না, তাই তার খোঁজ করুন যে, ১৯৪৫ সনের ছাত্রদের মাঝে সে কে, যে জীবন উৎসর্গ করেছিল।

ঘটনাক্রমে তাদের ঘরেও এই পত্র আসে। আর তিনি লিখে জানিয়ে দেন যে, আমিই ছিলাম সেই ছাত্র। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে নির্দেশ দেন, অনতিবিলম্বে রাবওয়া উপস্থিত হও আর তালীমুল ইসলাম কলেজ লাহোর-এ ভর্তি হও এবং বি.এ. ডিগ্রি অর্জন কর। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৫৩ সনে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণে নিমগ্ন ছিলাম আর এমনই সময় আহমদীয়া বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যায়। (সেই অবস্থার মধ্যেই তিনি পরীক্ষা দেন) এই পরীক্ষার ফলাফল বের হলে তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হই, কেননা আমি ফেল করি। কিন্তু একইসাথে আমার এই দুশ্চিন্তাও ছিল যে, ফেল-ই যদি আমার

> যে ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে আসে তাকে ইহজগৎ থেকে একদিন বিদায় নিতেই হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মসেবার তৌফিক দান করেন আর মানবতার সেবা করারও সুযোগ প্রদান করেন।

হওয়ার ছিল তাহলে পরীক্ষার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তো আমাকে স্বপ্নে প্রশ্নপত্রও দেখিয়েছিলেন যে, পরীক্ষায় এইসব প্রশ্ন আসবে, আর তা এসেছেও। সেইসাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও দৃঢ়তার সাথে আমাকে বলেছিলেন যে, তুমি পাশ করবে। তিনি বলেন, এসব কারণে মাঝে মধ্যেই আমার ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ত। এরপর পত্রিকায় ফলাফল প্রকাশ পায়। আমি মনমরা অবস্থায় বসা ছিলাম। আমার পিতা জিজ্ঞেস করেন যে, কি হয়েছে? আমি কারণ উল্লেখ করলে তিনি বলেন, কোন অসুবিধা নেই, আবার পরীক্ষা দিয়ে দিও। কেননা পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে

তুমি হয়তো প্রস্তুতি নিতে পার নি।

কয়েকদিন অতিবাহিত হতেই তার পিতা তাকে বলেন, আমি যখনই তোমার জন্য দোয়া করি তখন আমি এই ধ্বনিই শুনতে পাই যে, বশীর আহমদ পাশ করেছে। কিন্তু আমি যখন তাকে কলেজের ফলাফল দেখাতাম তখন তিনি নীরব হয়ে যেতেন। কয়েকদিন পর আবার বলতেন যে, আমি তো এই উত্তরই পাচ্ছি যে, তুমি পাশ করেছ। তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে একদিন ডাকযোগে দৈবক্রমে বহু পত্র এসে যায়। আর তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও একটি পত্র ছিল। আমি তা খুলে হতভম্ব হয়ে যাই কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ভুলবশত তোমাকে ফেল দেখানো হয়েছিল, এখন উত্তরপত্র পুনরায় যাচাইয়ের পর ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তুমি পাশ করেছ। তিনি বলেন, কিছুদিন পর আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে যাই এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, দোয়ার পর আমাকে তোমার পাশের সংবাদ জানানো হয়েছে যা আমি তোমাকে অবহিতও করেছিলাম যে, তুমি পাশ করবে। অতএব এই যে ফলাফল এসেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐশী সিদ্ধান্তকে কেউ টলাতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যা তিনি জানিয়েছিলেন। নতুবা এটি তো হাস্যোস্কর ব্যাপার হতো যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কেও এবং তার নিজ পিতাকেও একদিকে বলছেন যে, তিনি পাশ করবেন অথচ ফলাফল হয়েছে শেষ পর্যন্ত ভিন্ন। যাহোক সত্য প্রমাণিত হয়েছে সেই কথাই, যা আল্লাহ্ তা'লা অবহিত করেছিলেন।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বলেন, এখন তুমি জামেয়ায় ভর্তি হয়ে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন কর। আমার ইচ্ছা হলো, তোমাকে তবলীগের ময়দানে প্রেরণ করা। তিনি বলেন, জামেয়ায় আমাদের ক্লাসের এক বিশেষত্ব লাভ হয়েছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বেশ কয়েকবার আমাদের ক্লাসে স্বয়ং আসেন আর জ্ঞানমূলক বিভিন্ন বিষয়াদিতে দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করান। তখন খলীফা সানী (রা.) এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, প্রত্যেক ছাত্রেরই ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকা উচিত এবং বই ক্রয় করার অভ্যাসও থাকা উচিত। আর এটি এমন একটি কথা যা জামেয়ার সকল ছাত্রের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। পৃথিবীতে এখন বহু জামেয়া রয়েছে, আর অনেক ওয়াকেফে জিন্দেগী রয়েছে, তাদের সবার নিজস্ব লাইব্রেরী থাকা উচিত।

সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত মুরুব্বীদের মিটিংয়েও আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, মুরুব্বীদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকা উচিত। শুধু জামাতী লাইব্রেরীর ওপর নির্ভর করবেন না। তিনি বলেন, জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করার পর আমি ওকালতে তবশীর-এ উপস্থিত হই। সেই সময় মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব উকীলুত্ তবশীর ছিলেন। তিনি আমাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, একে ইংল্যান্ড পাঠিয়ে দেয়া হোক। ইংল্যান্ড যাওয়ার পূর্বে উকীলুত তবশীর সাহেব আমাকে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আবারও নিয়ে যান। হুযূর (রা.) আমাকে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং দোয়ার সাথে বিদায় দেন আর কোলাকুলি করেন। ১৯৫৯ সনে

তিনি যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত হন এবং সেখানে পৌঁছে যান। আর লন্ডনের ফযল মসজিদে নায়েব ইমাম হিসেবে তার কাজ আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, ১৯৫৯ সনে ইংল্যান্ড-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে তিনি একদিন মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেবের কাছে উপস্থিত হন এবং তাকে কিছু নসীহত করার জন্য অনুরোধ করেন।

মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব দীর্ঘদিন লন্ডন মসজিদের ইমাম হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি তাকে বিভিন্ন নসীহত করেন আর বলেন যে, আমি তোমাকে একটি নসীহত করছি যা থেকে আমি সারা জীবন অনেকটা লাভবান হয়েছি। শামস সাহেব বলেন, আমি যখন সিরিয়ায় মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত ছিলাম তখন একটি সম্পদশালী পরিবারের এক ব্যক্তি জনাব মুনীরুল হাসনী সাহেব আমার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বয়সে প্রবীণ হলেও তিনি নিবেদিতপ্রাণ একজন আহমদী ছিলেন। এরপরেই সিরিয়ায় জামাতের বিস্তার হয়।

তিনি বলেন, এরপর তার ধর্মসেবার প্রেরণা এবং চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুনীরুল হাসনী সাহেব প্রতিদিন আসরের পর মিশন হাউসে চলে আসতেন, সিরিয়াতে সে যুগে মিশন হাউস ছিল এবং কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তিনি বলেন, মিশন হাউসে এসে তিনি সাগ্রহে আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন, আর এই দায়িত্বে তিনি ছিলেন অনড়। রাতে আমরা উভয়ে সেই খাবার খেতাম। একদিন খাবার খেতে বসে মুনিরুল হাসনী সাহেবকে আমি বলি যে, আজ তরকারিতে লবণ বেশি হয়েছে, ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সাবধান থাকবেন।

মুনীরুল হাসনী সাহেব বেশ সম্পদশালী ছিলেন, কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বলেন, 'মৌলানা সাহেব! আপনি জানেন যে, আমার বাসায় কাজের জন্য বেশ কিছু সেবক রয়েছে,আমি সন্ধ্যায় যখন ঘরে যাই তখন আমার জুতার ফিতাও চাকরেরা এসে খুলে দেয়। আমি আমার ঘরে কোনদিন এক কাপ চা-ও নিজ হাতে বানাইনি। এখানে এসে আমি আপনার জন্য যে খাবার প্রস্তুত করি তা শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করি, নতুবা কোথায় আমি আর কোথায় তরকারি রান্না করা। তাই কখনও যদি মসলা কম বেশি হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কেননা খাবার রান্না করা আমার কাজ নয়।'

এই ঘটনা শুনিয়ে মৌলভী শামস সাহেব বলেন, এই ঘটনা থেকে আমি এটি শিখেছি যে, আগ্রহের সাথে যারা আমাদের অর্থাৎ মুবাল্লিগদের সেবা করে

তারা কখনোই আমাদের ব্যক্তিগত কোন গুণের কারণে তা করে না বরং খোদার সন্তুষ্টি এবং আহমদীয়া জামাতের ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে করে। তাই সবসময় এ কথা আমাদের দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত যে, মানুষ আমাদের যতটাই সেবা করে, এটি আমাদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ। যদি তারা এতে কোন ভুল করে তাহলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের কোন অধিকার আমাদের নেই বা তাদের সমালোচনা করারও কোন অধিকার নেই।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ সেবকবৃন্দ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে দান করেছেন, আর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সেই দান করা অব্যাহত রেখেছেন।

তিনি বলেন, লন্ডন মসজিদের ইমাম জনাব চৌধুরী রহমত খান সাহেব তার অসুস্থতার কারণে ১৯৬৪ সনে দেশে ফিরে যান এবং রফিক সাহেবকে মসজিদ ফযলের ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সনে বশীর রফিক সাহেব ইংরেজী পত্রিকা 'মুসলিম হ্যারাল্ড' প্রকাশ করা আরম্ভ করেন আর প্রথম দিকে তা দশ পৃষ্ঠা সম্বলিত ছিল। তিনি নিজেই এর এডিটর বা সম্পাদক ছিলেন এবং বাকি সব কাজও নিজেই করতেন। ১৯৬২ সনে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের প্রেরণায় পাক্ষিক 'আখবারে আহমদীয়া' পত্রিকা চালু করেন। তিনি বলেন, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাও আমি ছিলাম এবং দীর্ঘদিন এর সম্পাদক হওয়ার সম্মানও আমার লাভ হয়েছে আর এর জন্য নিয়মিত প্রবন্ধাদি লেখারও তৌফিক পাই। তিনি বহু জ্ঞানের অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক সূচীত পত্রিকা 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স'-এর সম্পাদক হওয়ার সম্মানও তিনি লাভ করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৭ সন থেকে আরম্ভ করে তার খিলাফতকালে পর্যায়ক্রমে আট বার ইউরোপ সফর করেন। এই সফরের সাতটিতেই মৌলানা বশীর রফিক সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও দু'বার সফরসঙ্গী হয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় তার। ১৯৭০ সনে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সনে আবার লন্ডন ফিরে আসেন। আর ইমাম হিসেবে নিজের পুরোনো দায়িত্ব পুনরায় বুঝে নেন।

১৯৭৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে তার প্রাইভেট সেক্রেটারী বা ব্যক্তিগত সচীব হিসেবে আমেরিকা ও কানাডা সফরে যাওয়ার সৌভাগ্যও তার হয়েছে। ১৯৭৮ সনের মে মাসে 'আন্তর্জাতিক কাসরে সালীব'যে সম্মেলন (লন্ডনে) হয়েছে তাতে অংশগ্রহণের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এসেছিলেন আর এর ব্যবস্থাপনাকে সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত করার জন্য ইংল্যান্ডের বন্ধুগণ, মসলিসে আমেলা এবং কনফারেন্স কমিটি দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করেন এবং টীমওয়ার্ক বা দলগত কাজের এক উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই কাজ তার নিগরানী বা তত্ত্বাবধানেই সাধিত হয়েছে।

১৯৬৪ থেকে ৭০, আর এরপর ৭১ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডন মসজিদের ইমাম ছিলেন। ১৯৬১ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত 'মুসলিম হ্যারাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ১৯৭০ থেকে ৭১ পর্যন্ত। এরপর ১৯৮৫ সনের নভেম্বরে তিনি তাহরীকে জাদীদের উকিলুদ দিওয়ান নিযুক্ত হন এবং ৮৭ সাল পর্যন্ত উকিলুদ দিওয়ান ছিলেন। রাবওয়ার উকিলুত তাসনীফ হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮২ থেকে ৮৫ পর্যন্ত। এডিশনাল উকীলুত তবশীর রাবওয়া হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৩ থেকে ৮৪ পর্যন্ত। এডিশনাল উকিলুত তাসনীফ, লন্ডন হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৭ থেকে ৯৭ পর্যন্ত।

'রিভিউ অব রিলিজিওন্স'-এর এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৩ থেকে ৮৫ পর্যন্ত। রিভিউ অব রিলিজিওন্স এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৮৮ থেকে ৯৫ পর্যন্ত। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মেম্বার ছিলেন ১৯৭১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত। ইফতাহ্ কমিটির মেম্বার ছিলেন১৯৭১ থেকে ৭৩ পর্যন্ত। কাযা বোর্ডের মেম্বার ছিলেন ১৯৮৪ থেকে ৮৭ পর্যন্ত।

অনুরূপভাবে অনেক জাগতিক পদেও কাজ করার সুযোগ তার হয়েছে। ওয়ান্ডস্ ওয়ার্থ রোটারী ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি, এরপর রোটারী ক্লাবের প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত হন।১৯৬৮ সনে লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান জনাব টাব ম্যান এর আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আর লাইবেরিয়ার অনারারী চীফ হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হয়।

তার পুত্র লিখেন, তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং গভীর আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করতেন, এমনকি নাম লিখে দোয়া করতেন যেন কারো নাম ভুলে না যান। অজস্র ধারায় দরূদ পড়তেন। আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে চাঁদার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। তার ভাই কর্ণেল নযীর সাহেব তার ঘটনা লিখেছেন, যা আমি পূর্বেই সংক্ষেপে বলেছিলাম যে, খলীফা সানী (রা.) যখন তাকে ডাকেন, তখন তিনি ল' কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে পাঠানোর জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার পিতার কাছে পত্র লিখলে তিনি বলেন যে, আমি আইন শাস্ত্র পড়ে জামাতের উত্তম সেবা করতে পারব।

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার উত্তরে লিখেছেন, জাগতিক নয় বরং আমাদের ধর্মীয় উকিলের প্রয়োজন। যে জাগতিক মর্যাদা, সম্মান, সম্পদ এবং উন্নতি সে দেখতে চায়, ওয়াকফের বরকতে আল্লাহ্ তা'লা তার সবই তাকে দান করবেন। তিনি বলেন, আমার পিতা (হুযূরের মন্তব্য জানিয়ে) আমার ভাইকে পত্র দেন। পত্র পাঠ করার পর কোন প্রশ্ন না করেই তিনি

নিজের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে রাবওয়া চলে যান। এছাড়া দেখুন, খোদা তা'লা কিভাবে এই কথাগুলো পূর্ণ করেছেন। তিনি আইনবিদ হলে হয়তো কেবল জাগতিক সম্মানই লাভ করতেন, কিন্তু এখন তার জাগতিক সম্মানও লাভ হয়েছে আর ধর্মসেবারও সুযোগ হয়েছে।

তার ভাই লিখেন, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যা লিখেছিলেন ওয়াকফের কল্যাণে সেই সবকিছুই তার লাভ হয়েছে, মর্যাদাও লাভ হয়েছে, আর খ্যাতি এবং সম্মানও পেয়েছেন। এক কথায় সবকিছুই তার লাভ হয়েছে। খোদার কৃপায় তিনি অত্যন্ত সফল কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন। খিলাফতের সাথে তার বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তার হৃদপিন্ডে অপারেশনও হয়েছে। এক সময় তো একেবারে আশাহীন এক অবস্থা ছিল।

এরপর খোদা তা'লা নবজীবন দান করেন। এই রোগের কারণে তিনি অত্যন্ত দুর্বলতায় ভুগতেন, কিন্তু রীতিমত তিনি আমাকে শুধু পত্রই লিখতেন না আর বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতাই প্রকাশ করতেন না বরং যখনই শুনতেন যে, আমি কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছি তখন অবশ্যই তিনিও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন। এরপর ওয়াকার এর সাহায্যে বা যেভাবেই হোক, অনেক সময় দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি দেখেছি তিনি জুমুআয় অবশ্যই আসতেন আর হেঁটেও আসতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন, তার পদর্যাদা উন্নীত করুন, আর তার সন্তান-সন্ততিকেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাসহ জামাতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

আমি যেমন বলেছি, দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ, মোহতারমা ডাক্তার নুসরাত জাঁহা মালেক সাহেবার যিনি মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ১১ই অক্টোবর লন্ডনে ইহধাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এমনিতে তিনি রাবওয়ায় বসবাস করতেন, তবে বৃটিশ নাগরিকও ছিলেন। প্রায় প্রতি বছরই লন্ডনেআসতেন। কিছুটা নিজের পেশাদারী দক্ষতা অর্জনের জন্যও বিভিন্ন হাসপাতালে যেতেন। কিছুদিন থেকে কিছুটা অসুস্থ্যও ছিলেন যার জন্য চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। তাই কিছুদিন যাবৎ এখানেই ছিলেন। জলসার পরে হঠাৎ তার বুকে ইনফেকশান হয় এবং তা অবনতির দিকে যেতে থাকে। এরপর ফুসফুসও কাজ করা বন্ধ করে দেয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এক পর্যায়ে কিছুটা আরোগ্যও লাভ হয় আর ডাক্তাররা আশার বাণীও শুনায়। কিন্তু একই সাথে আশঙ্কাও ছিল যে, দ্বিতীয়বার ইনফেকশান হলে মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে। যাহোক ঐশী তকদীর ছিল একদিন হঠাৎ তিনি পুনরায় আক্রান্ত হন আর কয়েক ঘন্টার ভিতরই ইন্তেকাল করেন।

১৯৫১ সনের ১৫ই অক্টোবর করাচীতে তার জন্ম হয়। ডাক্তার নুসরাত জাঁহা সাহেবার পিতা শ্রদ্ধেয় মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবও জামাতের নিষ্ঠাবান সেবকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত খান জুলফিকার আলী খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার পৈত্রিক নিবাস ছিল বাজনুর জেলার নজীবাবাদ গ্রাম, যা উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। তিনি অর্থাৎ ডাক্তার নুসরাত জাঁহা সাহেবার দাদা ১৯০০ সনে পত্রযোগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বয়আত করেন। পরবর্তীতে ১৯০৩ সনে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।

হযরত খান জুলফিকার আলী খান গওহর সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা ওবাসনা অনুসারে নিজ পুত্র মৌলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবকে ধর্মের খাতিরে শৈশবেই ওয়াকফ করেছিলেন। যদিও তার জন্ম পরেঅর্থাৎ ১৯১১ সনে হয়েছে। তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ সনে মৌলভী ফাযেল কোর্স শেষ করেন। এরপর ভালো একটি চাকরী হয় তার।

কিন্তু মৌলভী আব্দুল মালেক খান সাহেবের পিতা তাকে বলেন বা লিখেন যে, আমি তোমাকে জাগতিক আয় উপার্জনের জন্য পড়ালেখা করাইনি। কারো ধর্মীয় উপার্জনও করা দরকার। এই পত্র পেতেই মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব পদত্যাগ করে কাদিয়ান ফিরে এসে মুবাল্লিগ ক্লাসে যোগ দেন। আর এই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার প্রেরণাই ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবার মাঝেও বিদ্যমান ছিল।

তিনি পড়ালেখা শেষ করেন যুক্তরাজ্যে। পাকিস্তান থেকে প্রথমে এম বি বি এস করেন আর যুক্তরাজ্যে এসে স্পেশালাইজ করেন। তিনি যে কোন স্থানে গিয়ে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু ধর্ম এবং মানবতার সেবার জন্য ছোট এক শহর রাবওয়ায় এসে তিনি বসতি স্থাপন করেন আর সেই সময় হাসপাতালেরও প্রয়োজন ছিল, তাইতিনি সেই প্রয়োজন বা চাহিদা পূর্ণ করেন।

আর এরপর সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে এমন সেবা করেছেন যা ছিল পরম উন্নত মার্গের। তার সম্পর্কে অনেকেই নিজেদের আবেগ অনুভূতি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। সেগুলোর সব তুলে ধরা কঠিন, কিছু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তার একমাত্র কন্যা হলেন আয়েশা নুদরাত সাহেবা যিনি এখন যুক্তরাজ্যেই তার স্বামীর সাথে অবস্থান করছেন। তাদের তিন সন্তান রয়েছে।

আমি যেমনটি বলেছি, ডাক্তার সাহেবা পাকিস্তানের ফাতেমা জিন্নাহ্ মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. করেন। এরপর ইংল্যান্ড থেকে আর সি ও জি অর্থাৎ রয়েল কলেজ অব অবস্‌টেটরিশিয়ানস্ এনড গাইনিকোলোজিস্ট থেকে গাইনী বিষয়ে স্পেশালিস্টএর কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৮৫ সনে ফযলে উমর হাসপাতালে নিজের সেবাকর্ম আরম্ভ করেন,আর ১৯৮৫ সনের ২০শে এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত সেবার দায়িত্ব পালন করছিলেন। নিজের চিকিৎসার জন্য, আমি যেমনটি বলেছি, তার লিভারের অসুস্থতা ছিল, এর চিকিৎসার জন্য ছুটি নিয়ে গত

৫ই এপ্রিল লন্ডনে এসেছিলেন। চিকিৎসা চলছিল আর আল্লাহ্‌র ফযলে তা সফলও হয়। কিন্তু জলসার পর পুনরায় তার বুকে ইনফেকশান হয় আর তা থেকেও মনে হচ্ছিল যেন তিনি কিছুটা সুস্থতার দিকে। কিন্তু পুনরায় হঠাৎ রোগের হামলা হয় এবং তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

তার জামাতা মকবুল মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ওপর উনার সুগভীর আস্থা ও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ইবাদতের প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। কুরআনের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং খিলাফতের সাথে নিবিড় সম্পৃক্ততা ছিল। স্বতস্ফূর্ত ও একনিষ্ঠভাবে খিলাফতের আনুগত্য, মানব সেবা, রোগীদের আরোগ্য এবং তাদের আরামই তার কাছে ছিল অগ্রগণ্য বিষয়। আর এই কথাগুলো যা তিনি বর্ণনা করছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবেও এর সাক্ষী যে, তিনি এটি অতিরঞ্জন করছেন না বরং সত্যিকার অর্থেই এসব বৈশিষ্ট্য তার মাঝে ছিল সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। প্রত্যেক অপারেশন এবং চিকিৎসার পূর্বে দোয়া করতেন। প্রতিদিন সদকা দিতেন। রাবওয়ায় বসবাসকারী বুযুর্গদেরকে নিজের রোগীদের আরোগ্যের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতেন।

অনেক দরিদ্র রোগীদের নিজ খরচে বা বন্ধু বান্ধবদের খরচে চিকিৎসা করাতেন। জামাতের টাকা পয়সা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, সর্বদা চেষ্টা করতেন যেন অল্প খরচে কাজ হয় আর জামাতের এক পয়সাও যেন নষ্ট না হয়। তিনি বলেন, আমি লাহোরে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করতাম। আমাকে সবসময় জিজ্ঞেস করতেন যে, অমুক জিনিস তুমি কোন কোম্পানির কাছ থেকে কত মূল্যে ক্রয় করেছ, আর অমুক ঔষধ কোন কোম্পানির কাছ থেকে কত মূল্যে ক্রয় কর। এরপর যথাযথ মনে হলে একই জিনিস ফযলে উমর হাসপাতালের জন্য সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে ক্রয় করাতেন।

পিতা-মাতার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তাদের অনেক সেবাও করেছেন। মায়ের দীর্ঘ অসুস্থতার যুগে তিনি তার অনেক সেবা করেছেন। নিজের দায়িত্বও পালন করেছেন আর মায়ের সেবাও করেছেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজের শেষ দিনগুলো বড় ধৈর্য্যের মাঝে এবং সাহসিকতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। শেষ অসুস্থতার সময় হাসপাতালে প্রায় দুই মাস ছিলেন। সবসময় এটিই বলতেন যে, তিলাওয়াত শুনাও। ঘরে সন্তান-সন্ততিদেরও নামায এবং তিলাওয়াতের নির্দেশ দিতেন। সন্তান-সন্ততির মাঝে কোন পুণ্যের অভ্যাস দেখলে, তিলাওয়াত করতে দেখলে আনন্দিত হতেন, তাদেরকে পুরস্কার দিতেন, তাদের জন্য দোয়া করতেন।

মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আমাদের কন্যার বয়স যখন ১২ বছর, তখন তাকে মাথা ঢাকা এবং পর্দার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার নসীহত করতেন, আর হযরত আম্মাজান এবং অন্যান্য বুযুর্গদের বরাতে ছোট ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা ঘটনার আকারে শিশুদের শোনাতেন। নিজেও পর্দার ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন।

অতএব পিতামাতা এবং তাদের বড়রা যদি সন্তান-সন্ততিকে নসীহত করতে থাকেন তাহলে মেয়েদের মাঝে পর্দা না করার যে জড়তা রয়েছে তা দূর হয়ে যায় বরং এর সৎসাহস সৃষ্টি হয়।

ফযলে উমর হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার নুসরাত মাজুকা সাহেবা বলেন, আমি প্রায় ১৮ বছর ডাক্তার নুসরাত জাঁহা সাহেবার সঙ্গ লাভ করেছি। হাউজ যব শেষ করেই আমরা ফযলে উমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগের অংশ হয়ে যেতাম। আমার সমস্ত পেশাদারী প্রশিক্ষণ ডাক্তার সাহেবাই দিয়েছেন, তিনি একজন যোগ্য শিক্ষিকা ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার কাছে পথের দিশা পেতাম, সুদৃঢ় এবং সম্পূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। তিনি অনুগত এবং সহানুভূতিশীল কন্যাও ছিলেন আর একজন স্নেহময়ী মা-ও ছিলেন। একজন সুশৃঙ্খল শিক্ষিকাও ছিলেন এবং সহমর্মী বোন ও বান্ধবীও ছিলেন। তিনি বলেন, তার সারাটা জীবন ত্যাগে পরিপূর্ণ, জামাতের সেবার জন্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া-পাওয়া উপেক্ষা করেছেন। তার প্রিফারেন্সেস বা চাওয়া-পাওয়া সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক আলাদা ছিল। তিনি বলতেন যে, আমার দুইটি মেয়ে রয়েছে, একটি আমার নিজের কন্যা আর অপরটি হলো আমার কর্মবিভাগ। সর্বদা গাইনী বিভাগের উন্নতির চেষ্টায় রত থাকতেন।

রোগীদের সেবাদানে সব সময় সোচ্চার ও সচেতন থাকতেন, বিশেষ করে জামাতের দরিদ্র কর্মীদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। কারো স্ত্রী যদি অসুস্থ্য হতো তাহলে বারবার ফোন করে তাদের রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তার অধীনস্ত কর্মী বাহিনীকে খুবই ভালোবাসতেন, তাদের দিয়ে বেশি কাজ করালে, কোন ক্ষেত্রে কোন রোগীর সেবার কারণে, কাউকে যদি বেশি কাজ করাতে হয়, তাহলে ঘর থেকে তাদের জন্য খাবার পাঠাতেন। কঠিন মুহূর্তেও তাদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। প্রায় সবাই এই কথাটি লিখেছে যে, খিলাফতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আর এটিই সত্যকথা, খিলাফতের সাথে তার অসাধারণ সুসম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, গত বছর থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে সাথে রাখতেন। সকল প্রকার গাইনী সার্জারীও তিনি আমাকে শিখিয়েছেন এবং এটিও বলতেন যে, আমার হাতে সময় অতি অল্পই রয়েছে। তিনি বলেন, আমি তার কথার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, কেননা তিনি খুবই একটিভ ছিলেন, কিন্তু এখন তার মৃত্যুর পর, আমি বুঝতে পেরেছি যে, নিজের অসুস্থ্যতার কারণে, এর কিছু ধারনাও তিনি করেছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের ছেড়ে তিনি (মরহুমা ডাক্তার সাহেবা) চলে গেছেন। রাবওয়াবাসীর ওপর তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। আজ প্রতিটি চোখ অশ্রুসিক্ত, প্রতিটি হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত। আমার কাছে অনেক পত্র এসেছে, আর সকলেই সত্য কথাই লিখেছে।

ঘানায় আমাদের হাসপাতালের ডাক্তার আমাতুল হাই সাহেবা বলেন, আমিও ডাক্তার নুসরাত জাঁহা সাহেবার কাছ থেকে প্রাথমিক ট্রেনিং নিয়েছি। এরপর আমি ঘানা চলে গেলে হোয়াটসএ্যাপ এবং ই-মেইলে সব সময় আমার সাথে তার যোগাযোগ ছিল। গাইনী বিষয়ক কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি সানন্দে উত্তর দিতেন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। আর সকল সমস্যার সময় তিনি এটিই বলতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে দোয়ার জন্য লেখ। তিনি আরো লিখেন, ডাক্তার সাহেবার সাথে যখন কাজ করতাম তখন ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও তার দৃষ্টি থাকত। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, যখনই তিনি অতিরিক্ত কোন বাতি জ্বলতে দেখতেন তাৎক্ষণিকভাবে তা নিভিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, বিনা কারণে কেন জামাতের পয়সা নষ্ট করছ।

এছাড়া বিবাহিতদের বিয়ের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি বলতেন যে, রক্তের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে থাকে। তা যদি না থাকে তবে এটি কখনো সফল হয় না। আর এটি বেশ ভালো একটি ব্যবস্থাপত্র তিনি বলেছেন। সকল দম্পতির এটি মেনে চলা উচিত।

তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি রোগাক্রান্ত হওয়ার এবং লন্ডন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে তিনি আমাকে ফোন করেন এবং বলেন, রাবওয়ায় নতুন গাইনী থিয়েটার নির্মিত হয়েছে, ফিরে গিয়ে সেটি দেখা আমার জন্য সম্ভব হবে কিনা জানিনা। আমাকেও তিনি জানিয়েছিলেন, অথবা তিনি বলেন যে, দেরি হয়ে যেতে পারে তাই নাযেরে আ'লার হাতে এর উদ্বোধন করিয়ে নিন। আমি তাকে দিক-নির্দেশনা পাঠিয়েছি কেননা কোন ব্যক্তির কারণে জামাতের কাজ বন্ধ হতে পারে না।

রাবওয়ার তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এর ইনচার্জ ডাক্তার নূরী সাহেব বলেন, গত ৯ বছরের অধিক কাল থেকে শ্রদ্ধেয়া নুসরাত জাঁহা সাহেবার সাথে ফযলে উমর হাসপাতালের জুবায়দা বানি উইং এবং তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট এ কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মাঝে এমন কিছু গুণাবলী ছিল যা আজকাল অনেক কম ডাক্তারদের মাঝেই দেখা যায়। অত্যন্ত নেক, দোয়া পরায়ণ, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, খোদা ভীতি পোষণকারী, নিজের রোগীদের জন্য দোয়া পরায়ণ, সূক্ষ্মতার সাথে পর্দা করতে অভ্যস্ত, কুরআনের ব্যপক জ্ঞানের অধিকারী, মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরনকারী মহিলা ছিলেন।

তিনি যুক্তরাজ্যেও পড়ালেখা করেছেন আর এরপরও বিভিন্ন হাসপাতালে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আসতেন, কিন্তু সব সময়ই পর্দার ভিতরে থেকে। সম্পূর্ণ নেকাবের পর্দা করেছেন, এবং পুরো বোরকা পরিধান করেছেন, কিন্তু কখনো কোন প্রকার হীনমন্যতা ছিল না। আর পর্দার ভিতরে থেকেই সমস্ত কাজও করেছেন। তাই যেসব মেয়ে অজুহাত দেখায় যে, পর্দার ভিতরে থেকে আমরা কাজ করতে পারি না, তাদের জন্য তিনি অনুকরণীয় একজন আদর্শ নারী ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, নিজ বিভাগে গভীর দক্ষতা রাখতেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নিজের জ্ঞানকে যুগের দাবি অনুসারে বৃদ্ধি করে কাজ করতেন। কখনও সেবদান কর্তব্য পালনে নির্ধারিত দৈনন্দিন কর্মকালের দিকে তাকান নি। আর নিজের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল সেগুলোর অন্যায় ব্যবহার করেননি। গুরুতর অসুস্থ্য অবস্থায় থাকা রোগীদের জন্য নিজে ছুটি ভোগ করা বাদ দিয়ে দৈনিক বার ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতেন।

তিনি বলেন, আমার মনে আছে, একবার সন্তান-প্রসবের একটি জটিল কেস-এর সময় তিনি সারা রাত জেগে কাজ করেছেন। সম্ভাব্য অপশন সম্পর্কে রোগীদের বিস্তারিত অবহিত করতেন, যে কারণে তার ওপর রোগীদের আস্থা ছিল অনেক বেশী। সকল ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি শত ভাগ মেনে চলতেন।

নিজ দায়িত্ব পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত পালন করতেন। কেউ কেউ বলতো, আর আমাকেও অনেকে বলতো যে, তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যদি কঠোর হয়ে থাকেন তাহলে তা নীতি অনুসরণের কারণে, কিন্তু তার হৃদয় খুবই কোমল ছিল। উদারতা এবং সহানুভূতিও তার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ডাক্তার নূরী সাহেব বলেন, তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া এক বৃদ্ধা নারী তার নিজের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একবার ডাক্তার সাহেবা তার কাজ শেষ করে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি হাসপাতালের কাছে আকসা রোডে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং সেখানে দাঁড়িয়েই ঔষধ প্রস্তাব করেন, এরপর চলে যান।

তার বাগ্মিতাও ছিল অসাধারণ। তার পিতা মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবও খুবই উঁচু পর্যায়ের বক্তা ছিলেন। লাহোরের লাজনার সদর ফৌযিয়া শামীম সাহেবা, নূরী সাহেবকে অবহিত করেন যে, লাহোরের লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার জন্য তাকে ডাকা হলে, তার ব্যক্তিত্ব এবং বাগ্মিতার প্রভাব সবার ওপর সমানভাবে পড়ত। তার কথা-বার্তার কেন্দ্রবিন্দু হতো, আহমদীয়াত, খিলাফত এবং খোদার কৃপারাজির বিবরণ। তার বক্তৃতার ধরণে তার মরহুম পিতা আব্দুল মালেক খান সাহেবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত। খিলাফতের সাথে একান্ত বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। মিটিং, সেমিনার এবং ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালনের সময়ও খলীফায়ে ওয়াক্তের নির্দেশাবলীর উল্লেখ করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা শুধু বুলিসর্বস্ব ছিল না বরং তার কর্মেও তা প্রকাশ পেতো। সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শ নারী ছিলেন তিনি।

ডাক্তার মাহমুদ আহমদ আশরাফ সাহেব লিখেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদর্শিতায় ধন্য করেছিলেন। অনেক সময় রোগীর

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোন প্রোসিডিউর গ্রহণ কিছুটা বিলম্বিত করতেন, পরে তার সিদ্ধান্তই সঠিক প্রমানিত হতো। খুবই দক্ষ ব্যবস্থাপক ছিলেন, নিজ বিভাগের কাজ খুব সুন্দর ভাবে সমাধা করতেন। নিয়ম-নীতি মেনে চলতেন। নিজের অবস্থানকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেন। সকল বিষয় সঠিকভাবে খতিয়ে দেখা এবং ভবিষ্যতের জন্য তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ছিল তার অভ্যাস।

প্রশাসনিক বিষয়ে প্রতাপ ও প্রভাব নিজ জায়গায়, কিন্তু নিজ সহকর্মীদের প্রতি তিনি গভীর মমতা রাখতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখে অংশীদার হতেন। তার সহানুভূতি এবং স্নেহের গন্ডি কেবল আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, কর্মচারী এবং হাসপাতাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং কর্মচারীদের পরিবার, রোগী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন সকলকেই আমরা বারবার তার কাছ থেকে উপকৃত হতে দেখেছি। অভাবীদের খোলা মনে দান করতেন এবং তাদের আত্মসম্মান বোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নীরবে তাদের সেবা করতেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির রেকর্ড তিনি সংরক্ষিত রাখতেন। তিনি লেখেন, আমার জানা মতে তার নেতৃত্বে গাইনী বিভাগের রেকর্ড এখন সবচেয়ে উত্তম এবং সুন্দরভাবে সাজানো সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

একজন মুরব্বী ফুযায়েল আইয়্যায সাহেব লিখেন, তিনি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৮৯ সনে এই অধম যখন জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়াতে সেবার সুযোগ পাচ্ছিল তখন আমার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার সাহেবা আমাদের চিকিৎসা আরম্ভ করেন, সন্তান জন্মদান বিষয় ছিল বা অন্য কোন বিষয় ছিল। যাহোক খুবই স্নেহশীল, নম্র এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। চিকিৎসার সময় একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রী হিসেবে আমার স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানরা সব সময় তার বিশেষ স্নেহ এবং ভালোবাসায় ধন্য হয়েছে। আমাদের চার সন্তান, তিন মেয়ে এবং এক পুত্র, যাদের সবার জন্ম ফযলে উমর হাসপাতালেই হয়েছে। তিনি বলেন, আমি উনাকে সব সময় আমার সন্তানদের এবং তাদের মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন দেখেছি।

আমাদের ঘরে যখন চার কন্যার জন্ম হয়, (মনে হয় মোট চার কন্যা এবং এক পুত্র হবে), একবার আমার তৃতীয় কন্যা, যার বয়স তখন কেবল চার বছর ছিল তার ঘরে গিয়ে তাকে বলে, আমাদেরকেও ভাই এনে দিন। তখন ডাক্তার সাহেবা তাকে গভীর মমতা মাখা আদর করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর যেন তিনি তোমাদেরকে ভাই দান করেন। এরপর তার স্ত্রী যখন অন্তঃসত্তা হন তখন ডাক্তার সাহেবা নিজেও দোয়া করেছেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সমীপেও দোয়ার জন্য লিখেন। এছাড়া প্রত্যেক সাক্ষাতে সবার কাছে তার স্ত্রীর জন্য দোয়ার অনুরোধ করতেন। তিনি বলেন, অবশেষে খোদা কৃপা করেছেন, আর ছেলের জন্ম হওয়ার পর তিনি স্বয়ং এসে আমাদের ঘর থেকে আমাদের মেয়েকে নিয়ে যান এবং বলেন, এই নাও, খোদা তা'লা তোমাকে ভাই দিয়েছেন। এরপর নিজের গাড়িতে করে আমার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে যান।

তার কাছে অনেক অ-আহমদী রোগীও আসত। একবার তিনি নিজেই শুনিয়েছেন যে, চিনিওটের অ-আহমদী এক মৌলভী সাহেব আসে, তার স্ত্রীর সন্তান হচ্ছিল না। ডাক্তার সাহেবার চিকিৎসায় আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন এবং তার স্ত্রী অন্তঃসত্তা হয়। তিনি বলেন, এখন তো মৌলভী সাহেব ৯ মাস আমার নিয়ন্ত্রণে আছেন। আর তাকে তিনি এই ৯ মাস অনেক তবলীগ করেন এবং কোন প্রকার ভয়-ভীতি তখন তার ছিল না।

এরপর আরবী ডেস্কে কর্মরত তাহের নাদিম সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেবার ঔষধের চেয়ে দোয়ার ওপরই বেশি ভরসা ছিল। তিনি বলেন, আমি লন্ডন চলে আসলেও আমার স্ত্রী সেখানেই ছিল। তার (স্ত্রীর) কোন অপারেশনের প্রয়োজন ছিল, জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। ডাক্তার সাহেবা স্বয়ং জানিয়েছেন যে, তখন আমি কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছি যে, 'হে আল্লাহ্! ইনি ওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রী, তার স্বামী তোমার ধর্মের সেবার জন্য গিয়েছে, তাই তুমি কৃপা কর'।

অতএব কিছুক্ষণ পর খোদা তা'লা এমনভাবে ফযল করেন যে, যেই রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং অপারেশনেরও আর প্রয়োজন পড়েনি। তার আতিথেয়তা সম্পর্কে তাহের নাদিম সাহেব লিখেন যে, 'হিওয়ারুল মোবাশের' প্রোগ্রামের জন্য আরবরা এখানে আসে এবং অবস্থান করে, লন্ডনে ৫৩টি গেষ্ট হাউজ আছে। তিনি নিজেও সেখানে অবস্থান করছিলেন, আর আরবাও সেখানে অবস্থান করছিল। একদিন তিনি তার মেয়ের সাথে কিচেন বা রান্নাঘরে পরোটা প্রস্তুত করছিলেন। তিনি বলেন, আরবদের মাঝে আপনারা যারা এসেছেন এবং হিওয়ারুল মোবাশের প্রোগ্রামে যোগ দিচ্ছেন, আমি চেয়েছি আপনারা যারা ধর্মের সেবা করছেন তাদেরকে নিজ হাতে পরোটা বানিয়ে খাওয়াই, আর এভাবে আমি নিজেও যেন এই জিহাদের পুণ্যে অংশীদার হয়ে যাই।

আমাদের জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ার প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়্যায সাহেব তার সচেতনতা এবং পর্দা সম্পর্কে লিখেছেন যে, ডাক্তার সাহেবাকে সর্বদা পর্দা পরিহিতা এবং পর্দার সর্বোত্তম সাজ নিয়ে সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের মত দৌড়ঝাপ করতে দেখা যেত। যেসব মহিলা পর্দাকে বাঁধা মনে করেন তাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। সম্পূর্ণ দিন কাজ করতেন আর খুবই সক্রিয় ও কর্মঠ থাকতেন, কখনো ক্লান্তি প্রকাশ করতেন না।

ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব বলেন, সদর আঞ্জুমানের কোয়ার্টারে তখন আমরাও থাকতাম আর তিনিও থাকতেন। সে যুগে রাবওয়ার পরিবেশ ছিল আন্তরিক ও অকৃত্রিম, পারস্পরিক আসা-যাওয়া বা আনাগোনা ছিল খুবই সৌহার্দপূর্ণ। তিনি মওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেবের

পুত্র। তার পিতা এবং মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল। মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের যেহেতু কোন পুত্র সেখানে ছিল না তাই দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব তার পুত্রকে বলেন, তাদের বাড়ির খবরাখবর রাখবে যে, কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে কিনা, বাজার থেকে কিছু আনার বা ক্রয় করার প্রয়োজন হলে তা করে দিবে। তাই তিনি সেখানে যেতেন আর এদিক থেকে অত্যন্ত অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, এভাবে ডাক্তার সাহেবার সাথেও জানা-শোনা ছিল। তাকেও জিজ্ঞেস করতাম যে, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। এরপর হাসপাতালেও আমরা সহকর্মী ছিলাম। তার সামান্য কোন কাজ কেউ করে দিলে তিনি এত বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন সীমা থাকত না। এরপর তার সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী আর তাকেও উপহার সামগ্রী দিতেন।

তার বিভাগ ছিল গাইনী বিভাগ। তিনি লিখেন, এটিকে আধুনিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রায় প্রত্যেক বছর তিনি ইংল্যান্ড-এ গিয়ে নিত্য-নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে শিখে আসতেন, আর আসতেন ব্যক্তিগত খরচে। এমন নয় যে, জামাতি খরচে আসা যাওয়া করতেন। সেইসাথে বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়ে নতুন মেশিনও আনতেন। সম্প্রতি জোবাইদা বানী উইং-এর নতুন অপারেশন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, কিন্তু এটি ব্যবহারের সুযোগ পাননি। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান ডাক্তারদের সঠিকভাবে এটি ব্যবহারের তৌফিক দিন।

তিনি আরো লিখেন, এই বিভাগের বর্তমান সেবা-দান কাঠামো, যা একটি কক্ষ থেকে আরম্ভ হয়েছিল অর্থাৎ, ফযলে ওমর হাসপাতালের গাইনী বিভাগ শুধু একটি কক্ষেই সীমিত ছিল, আজকে এটি একটি পুরো উইং-এ রূপ নিয়েছে। আর এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডাক্তার নুসরাত জাঁহা সাহেবার যোগ্যতা এবং দিবা-রাত্রির পরিশ্রম আর আন্তরিক নিষ্ঠা ও আবেগ-অনুভূতি এবং উচ্ছ্বাসের গভীর ভূমিকা রয়েছে। তার একজন ষ্টাফ নার্স জামিলা সাহেবা লিখেন, ডাক্তার সাহেবার ইন্তেকালে আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। ডাক্তার সাহেবা খুবই ভালো এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী একজন ডাক্তার ছিলেন। আমাদের সবার প্রতি গভীর যত্নবান ছিলেন। আমাদেরকে সন্তানের মত ভালোবাসতেন এবং খুব যত্ন নিতেন। যে সমস্ত দরিদ্র বা গরীব রোগীরা আসত তাদের এন্ট্রি ফি-ও ফেরত দিয়ে দিতেন আর ঔষধও নিজের কাছ থেকেই প্রদান করতেন।

আরেকজন স্টাফ নার্স মুসাররাত সাহেবা লিখেন, সর্বোত্তম স্নেহশীল এক শিক্ষক এবং অত্যন্ত যোগ্য ডাক্তার ছিলেন। আমি প্রায় ৩১ বছর তার অধীনে অতিবাহিত করেছি। খুবই স্নেহময়ী ও সংবেদনশীল ছিলেন, প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে সঙ্গ দিতেন। বড়দের প্রতি সহানুভূতিশীল, শিশুদের প্রতি খুবই মমতাপূর্ণ আচরণ করা, রোগীদের সাথে ভালোবাসার ব্যবহার করা, তাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করা, সকল কর্মচারীকে সর্বদা উন্নত এবং ভালো ব্যবহারের উপদেশ দেয়া তার বৈশিষ্ট্য ছিল। খলীফার ডাকে যথারূপ সাড়া দানকারী এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

তার একজন মহিলা রোগী লিখেন, একবার আমার চিকিৎসা করছিলেন, আর একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর স্ত্রী হিসেবে আমার প্রতি অনেক মনোযোগ রাখতেন। একবার আমার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করানোর প্রয়োজন ছিল, তিনি তার সহকারীকে বলেন, তার আল্ট্রসোনোগ্রাম করে দাও, তখন অনেক ভিড় ছিল আর সেখানে একটি মাত্র চেয়ার ছিল যাতে একজন দরিদ্র মহিলা বসেছিলেন। যেহেতু ডাক্তার সাহেবা এ রোগীকে পাঠিয়েছেন তাই তার সহকারী সেই মহিলাকে উঠিয়ে তাকে চেয়ারে বসাতে চেয়েছেন। তখন হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ আসে যে, না, তুমি ঐ চেয়ারে নয় বরং এটিতে বস। আমরা দেখতে পাই যে, ডাক্তার সাহেবা নিজেই একটি চেয়ার নিয়ে আসছিলেন যেন দ্বিতীয় দরিদ্র মহিলা রোগী এটি মনে না করেন যে, আমাকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, কেননা সব রোগীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কিন্তু অপর দিকে তার অবস্থাও দেখেন, যার কারণে বসার জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য নিজেই চেয়ার নিয়ে আসেন এবং নিজেই মহিলা রোগীকে সেখানে বসিয়ে দেন।

এরপর আরেকজন ডাক্তার সাহেবা রয়েছেন, তিনি লিখেন, জামাতের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন, খিলাফতের প্রতি সুগভীর প্রেমময় সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজের সহকর্মী ডাক্তারদেরও উৎসাহিত করতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন কর এবং সব সময় দোয়ার জন্য লিখ। খলীফায়ে ওয়াক্ত-এর কাছে যখনই তিনি দোয়ার জন্য লিখতেন তখন আমাদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করতেন। তিনি লিখেন যে, আপনার পক্ষ থেকে যখনই কোন উত্তর আসত, সবাইকে তা পড়ে শুনাতেন। তখন তার চোখে এক আনন্দ বিরাজ করত আর তার কণ্ঠেও এবং তার চেহারা থেকেও তা স্পষ্ট বুঝা যেত।

তিনি বলেন, আমাদের সবার ঈমান বৃদ্ধির কারণ ছিলেন তিনি। জামাতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে নিজের জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্পদই শুধু কুরবানী করেন নি বরং নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের সমস্ত ডাক্তারদেরকে জীবন উৎসর্গ করা এবং জামাতের সেবা করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তার সাথে কাজ করে প্রতিদিনই ঈমান সতেজ হত আর হৃদয়ে ওয়াক্‌ফের গভীর প্রেরণা পেতাম। আমাদের প্রেস বিভাগের আবেদ খান সাহেব খিলাফতের সাথে তার সম্পর্ক এবং আনুগত্যের একটি ঘটনা লিখেছেন যে, একবার তিনি আমাকে বলেন, আমি যদি খলীফায়ে ওয়াক্তের মুখে কোন কথা ভাসা-ভাসাও শুনি, তাহলে তা নির্দেশ না হলেও বরং কোন সাধারণ কথা হলেও সেটিকে আমি নির্দেশই মনে করি এবং তা মেনে চলার চেষ্টা করি। অতএব, এই

হলো বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সেই মান, যা তার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

আরো অনেকেই তার সম্পর্কে লিখেছেন, এখন সব কিছু বলা কঠিন। এক মহিলা লিখেছেন, একবার আমি আমার ঘর থেকে, যা হাসপাতালের পিছনে, লাজনার অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম, আর তিনি জামাতের গাড়িতে করে বেরিয়ে আসছিলেন, কোন জামাতী কাজেই হয়তো যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, লাজনা অফিসে আমার অমুক ডিউটি আছে। তখন তিনি ড্রাইভারকে বলেন, প্রথমে তাকে লাজনার অফিসে নিয়ে যাও কেননা তিনি জামাতী কাজে যাচ্ছেন। এরপর তিনি বলেন, জামাতী গাড়ি আমি শুধু জামাতী কাজের জন্যই ব্যবহার করি।

তার কন্যা, নুদরাত আয়েশা সাহেবা বর্ণনা করেন, আমার মা একজন আদর্শ মা। তিনি খুবই স্নেহশীল একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য অনেক দোয়া করতেন। যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত তাৎক্ষণিক ভাবে মাকে ফোন করতাম, আর ফোন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পরবর্তীতে সেই কাজ সহজও হয়ে যেত। এরপর তিনি আমাকে বলতেন যে, তুমি কৃতজ্ঞতার সিজদা কর। সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার লালন-পালন এবং তরবিয়তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং সৎ সাহসী ছিলেন যে, পিতা-মাতা উভয় হয়েই তিনি আমাকে লালন-পালন করেছেন। কখনো তিনি যদি মনে করতেন যে, সঠিকভাবে কন্যার যত্ন নিতে পারেন নি তাহলে বলতেন, ব্যস্ততার কারণে মেয়েকে আমি ততটা সময় দিতে পারি না কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আরো বলতেন যে, মানবতার সেবায় যে সময় অতিবাহিত হয়েছে তার গুরুত্ব অনেক বেশি, আল্লাহ্ তা'লা আমার সন্তানের কাজ নিজেই সহজ করবেন। সব সময় আমাকে বলতেন, তোমাদের নানাজান তার সন্তানদের দু'টো নসীহত করেছেন, একটি হলো আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করা এবং দ্বিতীয়টি হলো, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা। আর সেই নসীহতই আমি তোমাকে করছি যে, সব সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো আর নিজেকে এবং সন্তান-সন্ততিদেরও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রেখো।

তিনি আরো লিখেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। যখন অসুস্থ্য হন আর ভেন্টিলেটার লাগানো হচ্ছিল তখন নামায পড়েন এবং আমার মোবাইলে থাকা কুরআন শরীফ হতে পাঠ করেন। আর একটি কাগজ এবং কলম চেয়ে নিয়ে তাতে লিখে দেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তকে বারবার দোয়ার বার্তা বা পয়গাম প্রেরণ কর। তিনি বলেন, আমি আমার মাকে অসাধারণ নিষ্ঠাবান এবং জামাতী খিদমতের প্রেরণায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। ফযলে ওমর হাসপাতালের ছোট একটি কন্সালটেশন কক্ষে মায়ের খিদমতের সূচনা হয়। এই কক্ষের একদিকে একটি কাউচ বা গদি আর অপর দিকে একটি সাদামাটা টেবিল চেয়ার রাখা ছিল। তার খিদমতের প্রেরণা এবং দোয়া প্রথমে তাকে লেবার ওয়ার্ড এবং এরপর গাইনী বিভাগের পৃথক বিল্ডিং দান করেছেন যেটিকে তিনি এবং তার টিম গভীর আগ্রহ ও প্রেরণার সাথে একটি সফল উইং-এ পরিবর্তন করেছেন। মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা জন্য তিনি লাহোর এবং ফয়সালাবাদ যেতেন আর কোন কোন সফরে আমিও তার সাথে ছিলাম। প্রত্যেক দোকানদারের কাছ থেকে তিনি কোটেশন নিতেন আর জামাতের পয়সা সাশ্রয়ের চেষ্টা করতেন।

তিনি বলেন, একবার আমার মেয়ে আলিয়া ১৫ দিনের জন্য রাবওয়া এসেছিল, তাকেও তার বিভাগের কাজে শামিল করেন যে, তুমি টাইপিং-এ সাহায্য কর, তোমার টাইপিং-এর গতি ভালো আর জামাতের সেবা করা একটি পরম সৌভাগ্য, তাই তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হও। নিজের কাজের প্রতি এমন একাগ্রতা ছিল যে, তার রোগের শেষ দিনগুলোতেও হাসপাতালের নাম শুনলে তার চেহারায় মুচকি হাসি চলে আসত। আর তন্দ্রার অবস্থাতেও হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার এবং বিভিন্ন মেশিন বানানোর কোম্পানির নাম নিতেন যা শুনে ইংরেজ নার্সরাও আশ্চর্য হত আর আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে, ইনি কী বলছেন? আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় তার গভীর তাওয়াক্কুল ছিল। রোগের ভয়াবহতার সময় কয়েকদিন তার জন্য কথা বলাও সম্ভব হয় নি। যখন স্পিকিং ভালব লাগান হয় তখন প্রথম যে বাক্য তার মুখ থেকে বের হয় তা হলো, হে আমার মেয়ে! আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। আর আমার কান্না পেলে চোখের ইশারায় আল্লাহ্‌র দিকে ইঙ্গীত করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার একমাত্র কন্যাকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, আর তার মা তাকে যে সমস্ত নসীহত করেছেন এবং তার কাছে যে সমস্ত প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই প্রত্যাশা পূরণের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা এই মেয়েকেও আর তার সন্তানদেরও নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন, মরহুমার পদমর্যাদাও উত্তরোত্তর উন্নীত করুন। আল্লাহ্ তা'লা ফযলে ওমর হাসপাতালকে এমন খিদমতকারী এবং বিশ্বস্ততার সাথে নিজ দায়িত্ব পালনকারী, আনুগত্যের সাথে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং খিলাফতের আনুগত্যকারী অরো ডাক্তার দান করতে থাকুন। আর বর্তমানে যারা এই কাজে রয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও উত্তরোত্তর নিজেদের কাজে উন্নতি দান করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি তাদের উভয়েরই গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

সকল আহমদী বিশেষ করে ওয়াকফে নও সন্তান এবং তাদের পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ

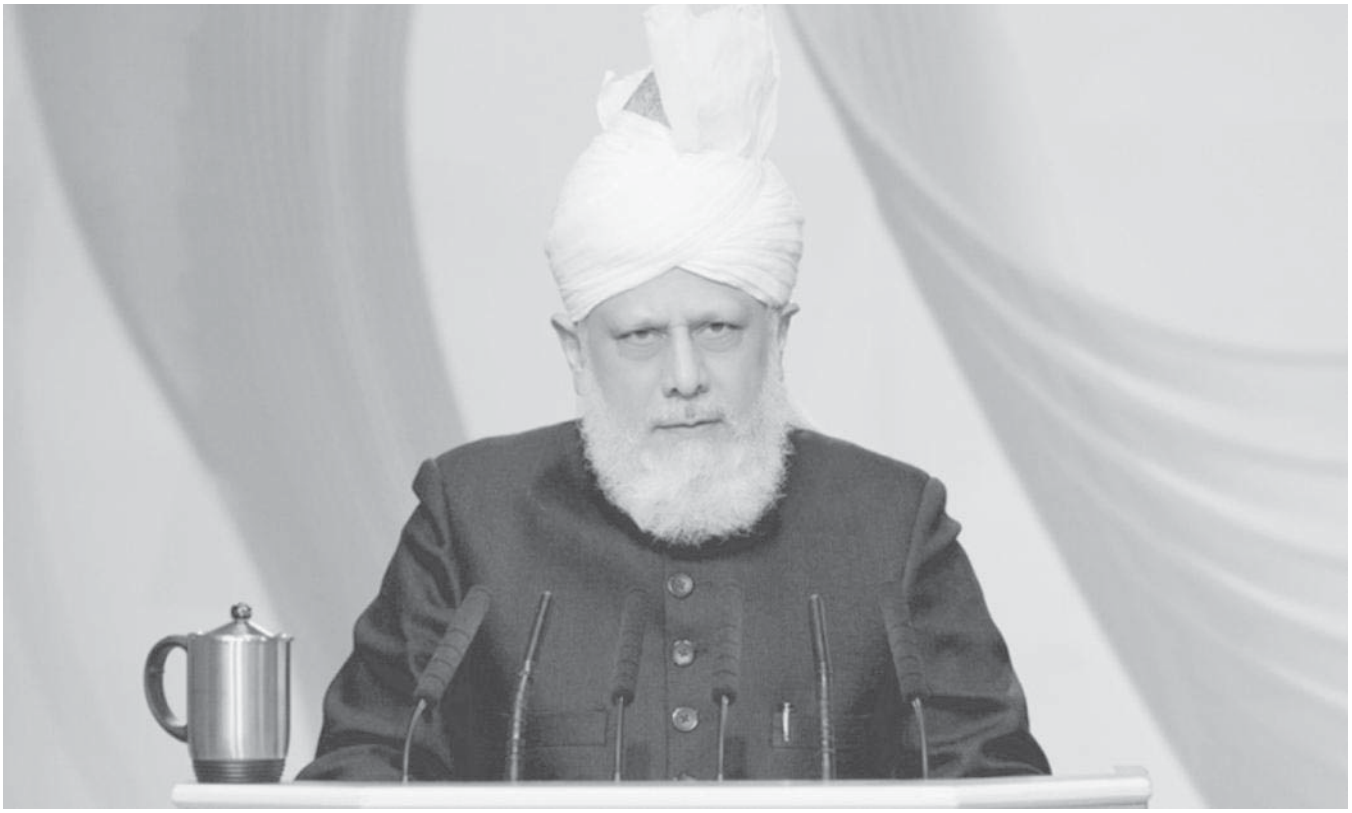

কানাডার টরন্টোস্থ বাইতুল ইসলাম মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতে সন্তানদের ওয়াকফ্ বা উৎসর্গ করার প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনই আমি পিতামাতাদের পক্ষ থেকে পত্র পেয়ে থাকি। কোন কোন দিন সেই চিঠির সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ টি পর্যন্ত হয়ে থাকে, যাতে পিতামাতারা তাদের গর্ভে থাকা সন্তানকে ওয়াক্‌ফে নও তাহ্‌রিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন এ তাহ্‌রীকটি করেছিলেন তখন প্রথমে এটি কোন স্থায়ী তাহ্‌রীক ছিল না, পরে এটিকে তিনি (রাহে.) স্থায়ী করেছেন। আর প্রতিটি দেশের জামাতে বিশেষ করে মায়েরা এ তাহ্‌রীকের অধীনে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। আজ থেকে বার-তের বছর পূর্বে ওয়াকফীনে নও-এর সংখ্যা ২৮ হাজারের অধিক ছিল আর এ দিকে জামাতের সদস্যদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এখন এ সংখ্যা প্রায় ৬১ হাজারের মত। যাদের মধ্যে ৩৬ হাজারের অধিক ছেলে এবং বাকিরা মেয়ে। অর্থাৎ কালের প্রবাহে স্বীয় সন্তানকে জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করার

প্রবনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু সন্তানদের কেবল উৎসর্গ করেই পিতামাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং পূর্বাপেক্ষা দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে একজন আহমদী শিশুর তরবিয়্যত বা সুশিক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার উপর ন্যস্ত আর পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, তাদের জাগতিক শিক্ষা, তরবিয়্যত এবং ধর্মীয় শিক্ষাও দিতে চান, যদি পিতামাতার মাঝে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ থাকে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল শিশু বিশেষ করে ওয়াক্‌ফে নও শিশু পিতামাতার কাছে জামাতের আমানত। তাদের তরবিয়ত বা সুশিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে জামাত ও সমাজের উৎকৃষ্ট অংশে পরিণত করা পিতামাতার আবশ্যিক দায়িত্ব। কিন্তু ওয়াক্‌ফে নও শিশু সন্তানের সুশিক্ষা, তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং তাদেরকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করে জামাতের হাতে অর্পণ করা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও দায়িত্ব হিসেবে বর্তায় যে, সন্তানের জন্মের পূর্বেই পিতামাতা যে অঙ্গীকার করে, 'আমাদের ঘরে ছেলে বা মেয়ে যা-ই জন্ম নিক না কেন আমরা তাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের সেই মিশনের পূর্ণতার জন্য উৎসর্গ করব, যা সত্য প্রচারের পূর্ণতা সাধনের মিশন, যা ইসলামী শিক্ষাকে বিশ্বের বুকে প্রচার ও প্রসারের মিশন, যা আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নিবদ্ধ করানোর মিশন এবং যা পরস্পরের অধিকার প্রদান সংক্রান্ত ইসলামের শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রতিটি স্তর ও ব্যক্তি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোর মিশন।'

কাজেই এটি সামান্য কোন দায়িত্ব নয়, যা ওয়াক্‌ফে নও সন্তানের পিতামাতা, বিশেষ করে মা তার অনাগত সন্তান জন্ম গ্রহণের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাঁর সমীপে নিবেদন করেন। আর তারা যুগ খলীফাকে লিখেও থাকেন, আমরা আমাদের সন্তানকে হযরত মরিয়ম-এর মায়ের মত আল্লাহ্‌র সাথে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে ওয়াক্‌ফে নও স্কিমের অধিনে পেশ করছি যে,

رَبِّ اِنِّیۡ نَذَرۡتُ لَکَ مَا فِیۡ بَطۡنِیۡ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلۡ مِنِّیۡ ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

(সূরা আলে ইমরান, ৩৬) অর্থাৎ হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! যা কিছু আমার গর্ভে আছে আমি তা তোমার জন্য উৎসর্গ করছি। জানি না কী হবে, ছেলে নাকি মেয়ে? কিন্তু যা-ই হোক আমার বাসনা ও দোয়া হল, সে যেন ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সেবক হয়।

فَتَقَبَّلۡ مِنِّیۡ

তুমি আমার এ বাসনা ও দোয়া কবুল কর এবং তাকে গ্রহণ কর।

اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

নিশ্চয়ই তুমি সর্বোশ্রোতা এবং সর্বোজ্ঞানী। অতএব, তুমি আমার বিনীত দোয়া কবুল কর। আমি জানি, এ দোয়া আমার হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধ্বনি। সন্তানকে ওয়াক্‌ফ করার পূর্বেই মায়েদের এ বাসনা থাকে আর সন্তানকে ওয়াকফ করার সময় একজন আহমদী মায়ের ক্ষেত্রে এমনই হওয়া উচিত। আর পিতাও এতে অন্তর্ভূক্ত থাকেন।

অতএব, ওয়াক্‌ফেনও-এ অন্তর্ভূক্তকারীণী মায়েরা যেখানে এরূপ দোয়া করেন সেখানে সেই সব দায়িত্বের চেতনাও তাদের মাঝে থাকা উচিত যা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং এই দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য পিতামাতার উপর ন্যস্ত হয়। পিতামাতা উভয়ের সিদ্ধান্তের পর সন্তান ওয়াক্‌ফে নও-এর অন্তর্ভূক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এ দোয়া কোন কাহিনী শোনানোর জন্য কুরআন করীমে সংরক্ষণ করেন নি। বরং এ দোয়া খোদার দৃষ্টিতে এতটা পছন্দনীয় এবং এটিকে এজন্য সংরক্ষণ করেছেন যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের মায়েরাও

সন্তানদের কেবল উৎসর্গ করেই পিতামাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল শিশু বিশেষ করে ওয়াক্‌ফে নও শিশু পিতামাতার কাছে জামাতের আমানত। তাদের তরবিয়ত বা সুশিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে জামাত ও সমাজের উৎকৃষ্ট অংশে পরিণত করা পিতামাতার আবশ্যিক দায়িত্ব।

এ দোয়ার প্রেরণায় নিজেদের সন্তানকে ধর্মের স্বার্থে অসাধারণ ত্যাগী হিসেবে প্রস্তুত করবেন। যদিও সকল মুমিনই ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করে থাকেন কিন্তু যারা ওয়াক্‌ফ করে তাদেরকে এসব মানদন্ডের চরম মার্গে উপনীত হওয়া উচিত। অতএব, মাতাপিতারা যদি শুরু থেকেই সন্তানদের মাথায় এ কথা গেঁথে দেন যে, তোমরা ওয়াকফ বা জীবন উৎসর্গকারী আর আমরা তোমাদেরকে শুধুমাত্র ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম তাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত। একই সাথে তারা যদি দোয়াতে রত থাকেন তবে সন্তানেরা এ চিন্তা চেতনার সাথে বড় হবে যে, তাদেরকে ধর্মসেবা করতে হবে। এই মন-

মানসিকতা নিয়ে বড় হবে না যে, আমরা বড় হয়ে ব্যবসায়ী হব, খেলোয়াড় হব বা অমুক বিশেষ বিভাগে কাজ করব অথবা অমুক পেশা অবলম্বন করব। বরং তারা জিজ্ঞেস করবে, আমি একজন ওয়াক্‌ফে নও, জামাত বা যুগ-খলীফা আমাকে অবহিত করুন, আমি কোন্ কর্মপথ অবলম্বন করব, বস্তুজগত নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার মা আমার জন্মের পূর্বেই যে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং যে সব দোয়া তিনি আমার জন্মের পূর্বে করেছিলেন আর এরপর এমন ভাবে আমার তরবিয়্যত করেছেন যে, আমি যেন বস্তুজগতের পরিবর্তে ধর্মের অনুসন্ধানী হই। আমি সৌভাগ্যবান, কেননা আমার মায়ের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং আমার সুশিক্ষার জন্য আমার মা যে প্রচেষ্টা করেছেন সেটিকে আল্লাহ্ তা'লা ফলপ্রদ করেছেন। এখন আমি কোন জাগতিক লোভ, লিপ্সা এবং বাসনার বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি।

১৫ বছর বয়সে নিজেদের ওয়াক্‌ফ নবায়ন করার সময় ওয়াক্‌ফে নওদের প্রথমেই এ চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছি, তাদের১৫ বছর বয়স হলে তাদের কাছ থেকে আপনারা যথারীতি এ লিখিত নিন যে, 'তারা ওয়াকফ থাকবে এবং ওয়াক্‌ফ অব্যাহত রাখতে চায়।' আবার ২০ বা ২১ বছর বয়সে উপনীত হলে তাদের পড়াশোনা যখন শেষ হয়ে যায় তখন যারা জামেয়াতে ভর্তি হয় নি এমন সবার জন্য আবশ্যক তারা যেন পুণরায় এ অঙ্গীকারটি নবায়ন করে। এরপর কাউকে যদি বলা হয়, কোন নির্দিষ্ট বিভাগে প্রশিক্ষণ নাও তবে পুণরায় তাদের কাছ থেকে লিখিত নিন। এক কথায় ওয়াক্‌ফে নওদের উচিত প্রতিটি স্তরে তারা যেন তাদের আন্তরিক বাসনা অনুসারে স্বীয় ওয়াক্‌ফ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার নবায়ন করে।

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বিস্তারিত বলেছি। কোন ওয়াক্‌ফে নও ছেলে বা মেয়ের মন-মানসিকতা এটি হওয়া উচিত নয় যে, আমি যদি ওয়াক্‌ফ করি তবে আমাদের জীবিকার কী হবে? অথবা কোন ছেলে বা মেয়ের মাথায় যদি এ কুমন্ত্রণা জন্মে যে, আমরা পিতামাতার আর্থিক বা অন্য সব দৈহিক সেবা কিভাবে করব? সম্প্রতি এখানে ওয়াক্‌ফে নওদের সাথে আমার ক্লাস ছিল, আর এক ছেলে প্রশ্ন করেছে, আমরা যদি ওয়াক্‌ফ করে জামাতের সেবায় পুরো সময় অতিবাহিত করি তবে পিতামাতার আর্থিক বা দৈহিক সেবা কিভাবে করতে সক্ষম হব? এ প্রশ্ন মাথায় দানা বাধার অর্থ পিতামাতা শৈশব থেকে তাদের ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের হৃদয়ে এ কথা গ্রথিত করেন নি যে, আমরা তোমাকে (আল্লাহ্‌র পথে) উৎসর্গ করেছি, এখন তুমি আমাদের কাছে শুধু জামাতের আমানত স্বরূপ রয়েছ। তোমাদের অন্যান্য ভাইবোন আমাদের সেবা করবে। তুমি নিজেকে যুগ খলীফার সমীপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে এবং তাঁরই নির্দেশ অনুসারে তুমি চলবে।

হযরত মরিয়ম-এর মায়ের দোয়াতে, 'মুহার্‌রারান'যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হল, এ সন্তানকে আমি জাগতিক দায়িত্বাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়েছি। আর আমি দোয়া করি, শতভাগ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই যেন তার জীবনের ব্রত হয়।

অতএব, সেই সব মা এবং পিতাকে আমি সর্ব প্রথম বলতে চাই যে, শুধু 'ওয়াক্‌ফে নও' নাম ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াকফ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের নাম। একজন ওয়াক্‌ফে নও-এর যৌবনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত প্রথমে পিতামাতার এবং পরে তার নিজের উপর এ দায়িত্বটি বর্তায়। জাগতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন ছেলেমেয়ে বাহ্যত অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিজেকে ওয়াকফ করে কিন্তু পরে যে দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে তা হল, জামাত যে ভাতা বা বেতন দেয় তাতে তাদের চলে না তাই তারা ওয়াকফ ছেড়ে চলে যায়। একটি মহান উদ্দেশ্য সফল করতে হলে কষ্ট সহ্য এবং কুরবানী তো করতেই হয়। কাজেই শৈশবেই যদি এ সব ওয়াক্‌ফ ছেলেমেয়ের মন-মস্তিষ্কে এই কথা গ্রথিত করে দেয়া হয় যে, জীবন উৎসর্গ করার চেয়ে বড় কিছুই আর নেই। 'আমার অমুক সহপাঠী আমার সমপর্যায়ের শিক্ষা অর্জন করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে আর আমি পুরো মাসে তার একদিনের সমপরিমাণ আয় করতে পারি না।' জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এরূপ চিন্তা করার পরিবর্তে এমন চিন্তা থাকা উচিত যে, 'আল্লাহ্ আমাকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা জাগতিক অর্থবিত্তের তুলনায় অনেক উচ্চ মার্গের"। মহানবী (সা.)-এর এ উক্তিকে সামনে রাখুন যে, জাগতিক সহায়-সম্পত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে অস্বচ্ছল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দাও আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে উচ্চ মার্গের ব্যক্তিকে দেখ, যেন জাগতিক প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর। (বুখারী কিতাবুর রিকাক, বাব লিইয়ানযুরু ইলা মিন হাওয়া আসফালাহ মিনহু, হাদীস নম্বর-৬৪৯০) (ফাতহুল বারী, শরহ সহী বুখারী... হাদীস নম্বর-৬৪৯০, খন্ড ১১, পৃ ৩৯২, ক্বদীমি কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী কর্তৃক মূদ্রিত)

অতএব, যে সব ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা তাদের পড়াশোনা শেষ করেছে, তারা নিজেরাও যেন তাদের বাহ্যিক, জাগতিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির চেষ্টা করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো সকল আহমদীর কাছে এ প্রত্যাশাই রাখেন যে, তার মান যেন অতীব উচ্চ হয়। অতএব, সেই ব্যক্তিকে এসব মানে উপনীত

কোন ওয়াক্‌ফে নও ছেলে বা মেয়ের মন-মানসিকতা এটি হওয়া উচিত নয় যে, আমি যদি ওয়াক্‌ফ করি তবে আমাদের জীবিকার কী হবে? অথবা কোন ছেলে বা মেয়ের মাথায় যদি এ কুমন্ত্রণা জন্মে যে, আমরা পিতামাতার আর্থিক বা অন্য সব দৈহিক সেবা কিভাবে করব? সম্প্রতি এখানে ওয়াক্‌ফে নওদের সাথে আমার ক্লাস ছিল, আর এক ছেলে প্রশ্ন করেছে, আমরা যদি ওয়াক্‌ফ করে জামাতের সেবায় পুরো সময় অতিবাহিত করি তবে পিতামাতার আর্থিক বা দৈহিক সেবা কিভাবে করতে সক্ষম হব?

হওয়ার জন্য কতটা চেষ্টা করা উচিত যাকে তার পিতামাতা তার জন্মের পূর্বেই ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছেন আর তার জন্য দোয়াও করেছেন!

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার জামাতকে ওসীয়্যত করা এবং তাদের কাছে এ কথা পৌঁছে দেয়াকে আমি আমার দায়িত্ব মনে করি যে, ভবিষ্যতে এটি শোনা বা না শোনার ক্ষেত্রে তারা সবাই স্বাধীন। অর্থাৎ যদি কেউ পরিত্রাণ চায় এবং পবিত্র জীবন ও চিরস্থায়ী জীবনের সন্ধানী হয়ে থাকে তবে সে যেন আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর সবাই যেন এ মর্যাদা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং গভীর ভাবনায় নিয়োজিত হয়, যেন সে বলতে পারে, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার কুরবাণী এবং আমার নামায এ সবই শুধু আল্লাহ্ তা'লার জন্য। আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মত তার আত্মাও যেন উদাত্ত ঘোষণা দিয়ে বলে উঠে,

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(আল বাকারা ঃ ১৩২) অর্থাৎ আমি তো আমরা প্রভূ-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দরবারে আত্মসমর্পন করে ফেলেছি।"

হুযূর (আ.) বলেছেন, "যতক্ষণ না মানুষ খোদার সত্তায় নিজেকে বিলীন করবে এবং খোদার জন্য মৃত্যুকে বরণ করবে, সে সেই জীবন লাভ করতে পারে না। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তারা প্রতিনিয়তই দেখছ, খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে আমি আমার জীবনের মূল এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করি।" এটিই হল ভিত্তি আর এটিই হল উদ্দেশ্য। "তোমরা নিজেদের খতিয়ে দেখ, তোমাদের মাঝে এমন ক'জন আছে যারা আমার এ কাজকে নিজেদের জন্য পছন্দ করে আর খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করে। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ, ১০০, সংস্করণ ১৯৮৫, লন্ডন)

অতএব, ওয়াক্‌ফে নওদের উচিত এ মর্যদা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ আহমদীদের তুলনায় অধিক চেষ্টা করা। ওয়াকফে নও ছাড়া অন্যরাও ধর্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে, তবে সবার জন্য জীবন উৎসর্গ করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেছেন যে, তোমাদের একটি দল এমন হওয়া উচিত যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে ফিরে যাবে আর স্বজাতিকে সে বিষয়ে অবহিত করবে। মানুষ জাগতিক কাজকর্মেও লিপ্ত থাকে কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, জাগতিক কাজ করার সময়ও খোদাভীতি এবং ধর্ম প্রাধান্য পাওয়া উচিত। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ, ৯১, সংস্করণ ১৯৮৫, লন্ডন)

ওয়াক্‌ফে নওদের উচিত তাদের স্বল্পেতুষ্ট থাকার মান এবং কুরবানীর মানকেও অনেক উন্নত করা। এটি ভাবা উচিত নয় যে, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল হলে আমাদের ভাইবোনেরা আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে বা পিতামাতা আমাদের প্রতি সেভাবে মনোযোগ দিবেন না যেভাবে অন্যদের প্রতি দেন। প্রথমতঃ পিতামাতার মাথায় কখনোই এমন ধারনার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর মান নিম্ন। বরং তাদের দৃষ্টিতে ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর মান ও মর্যাদা অন্যদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে থাকা উচিত। কিন্তু যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের উচিত নিজেদেরকে সর্বদা পৃথিবীর সবচেয়ে বিনয়ী বা তুচ্ছ মানুষ জ্ঞান করা।

ওয়াক্‌ফে নওদের কুরবানী বা ত্যাগের মান যেমন উন্নত করা উচিত তেমনি নিজেদের ইবাদতের মানকেও উন্নত করতে হবে, স্বীয় বিশ্বস্ততার মানও উন্নততর করতে হবে। নিজের এবং পিতামাতার কৃত অঙ্গীকার রক্ষার জন্য সকল শক্তি-সামর্থ এবং যোগ্যতাকে ধর্মের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত, ধর্মের সুনাম অক্ষুন্ন ও সমুন্নত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকা উচিত। আর তখন আল্লাহ্ তা'লাও স্বীয় দানে ভূষিত করেন। প্রতিদান থেকে কাউকেই তিনি বঞ্চিত রাখেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার বিষয়ে নসিহত করতে গিয়ে বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর

যে সব ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা তাদের পড়াশোনা শেষ করেছে, তারা নিজেরাও যেন তাদের বাহ্যিক, জাগতিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির চেষ্টা করে।

ওয়াক্‌ফে নওদের উচিত তাদের স্বল্পেতুষ্ট থাকার মান এবং কুরবানীর মানকেও অনেক উন্নত করা।

প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَإِبْرٰهِيمَ الَّذِي وَفّٰى ﴿٣٨﴾

(সূরা আন্ নজম: ৩৮) অর্থাৎ তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন তা রক্ষা করেছেন। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ, ২৩৪ সংস্করণ ১৯৮৫, লন্ডন)

অতএব, অঙ্গীকার পূর্ণ করা সামান্য কোন বিষয় নয়। ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকুতিপূর্ণ কথা আমরা শুনেছি, কত মহান অঙ্গীকার এটি। সকল ওয়াক্‌ফে নও ছেলে এবং মেয়ে যদি নিজেদের এ অঙ্গীকার বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করে তবে আমরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব আনয়ন করতে পারি। কতক যুবক-যুবতী দম্পতি আমার কাছে আসে এবং বলে, আমি ওয়াক্‌ফে নও, আমার স্ত্রী ওয়াক্‌ফে নও এবং আমার সন্তানও ওয়াক্‌ফে নও। অথবা মা বলে, আমি ওয়াক্‌ফে নও, পিতাও বলে, আমি ওয়াক্‌ফে নও আর আমাদের সন্তানও ওয়াক্‌ফে নও। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কথা কিন্তু জামাত এর সত্যিকার কল্যাণ তখনই লাভ করবে যখন বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের ওয়াক্‌ফের অঙ্গীকার রক্ষা করা হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে বিশ্বস্ততার বিষয়টিকে অন্যত্র এক স্থানে আরো সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন এবং এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, খোদার নৈকট্য অর্জনের পথ হল, খোদার জন্য যেন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা হয়, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের বিশ্বস্ততা যেন সত্য সাব্যস্ত হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদা তা'লার যে নৈকট্য অর্জন করেছেন এর কারণও এটিই ছিল। যেমন তিনি বলেন,

الَّذِي وَفّٰى

অর্থাৎ ইনি-ই হলেন সেই ইব্রাহীম যিনি বিশ্বস্ততা সুরক্ষা করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন, এক মৃত্যুর দাবি রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বস্তুজগত আর এর সমস্ত ভোগবিলাস ও মোহকে পদদলিত করার জন্য প্রস্তুত না হয় এবং সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং দুঃখ-কষ্ট খোদার খাতির সহ্য করতে প্রস্তুত না হবে, এ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতীমা পূজা কেবল কোন বৃক্ষ বা পাথরকে পূজা করাকে বলে না বরং প্রতিটি এমন বস্তু যা খোদার নৈকট্যের পথে বাদ সাধে আর তাঁর উপর প্রাধান্য পায় সেটিই প্রতীমা, আর মানুষ তার নিজের ভিতর এত প্রতীমা রাখে যে, সে বুঝতেই পারে না,'আমি এত-শত প্রতীমার পূজা করছি।'

আজকের যুগে কোথাও নাটক, কোথাও ইন্টারনেট, কোথাও জাগতিক আয়-উপার্জন প্রতীমার ভূমিকা পালন করছে, কোথাও অন্য কামনা-বাসনা মূর্তি এবং প্রতীমা সেজে বসে আছে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ জানেই না যে সে প্রতীমা পূজায় লিপ্ত অথচ ভিতরে ভিতরে সে আসলে প্রতীমা পূজা করছে। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আন্তরিকভাবে খোদার না হবে আর তাঁর পথে সকল সমস্যা মাথা পেতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ সেই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া কঠিন। তিনি (আ.) বলেন, ইব্রাহীম (আ.) যে উপাধি লাভ করেছেন এটি কি এত সহজেই লাভ হয়েছে? না, মোটেই না।

وَإِبْرٰهِيمَ الَّذِي وَفّٰى ﴿٣٨﴾

ধ্বনি তখন এসেছে যখন তিনি সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্ম চান এবং সৎকর্মে তিনি সন্তুষ্ট হন আর দুঃখ বরণের মাধ্যমেই সৎকর্ম করার তৌফিক লাভ হয়। অর্থাৎ মানুষকে সৎকর্মের জন্য, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে এমন কাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিতে হয়।

তিনি (আ.) বলেন, 'মানুষ সব সময় দুঃখে নিমজ্জিত থাকে না। সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য দুঃখ স্বীকার করতে হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সবসময় মানুষ দুঃখে নিমজ্জিত থাকে না'। তিনি (আ.) বলেন, "তবে মানুষ যখন খোদার জন্য দুঃখ বরণে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুঃখে নিপতিত করেন না। ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের জন্য স্বীয়পুত্রকে জবাই করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহন করেন তখন খোদা তা'লা তার সন্তানকে রক্ষা করেন। ছেলের

জীবনও রক্ষা পায় আর পিতা হয়ে ছেলেকে জবাই করার ফলে যেই কষ্ট হওয়ার ছিল সেই কষ্ট থেকেও তিনি রক্ষা পেয়েছেন"। তিনি বলেন, "ইবরাহীম (আ.) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আগুন তাঁর উপর কোন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি"। তিনি (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার পথে কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করে থাকেন। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ, ৪২৯-৪৩০ সংস্করণ ১৯৮৫, লন্ডন)

অতএব, এই হল খোদার স্নেহভাজন হওয়ার এবং তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার মানদন্ড, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, আর আমাদের কাছে এটি অর্জনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এই মানে উপনীত হওয়ার জন্য শুধু সকল ওয়াক্‌ফে নও-ই চেষ্টা করবে না বরং সকল ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীকেও এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরবানীর মান উন্নত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জীবন উৎসর্গ করার দাবি অন্তঃসার শূন্য প্রমানিত হবে।

কোন কোন মা বলে থাকেন, আমরা কানাডায় স্থানান্তরিত হয়েছি, আমাদের ছেলে পাকিস্তানে জামাতের মুরুব্বী বা ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী, তাকেও এখানে ডেকে পাঠান এবং এখানেই তাকে দায়িত্বে নিয়োজিত করে দিন, যেন তারা আমাদের কাছে আসতে পারে। জীবন উৎসর্গ করার পর এটি আবার কোন ধরণের দাবি এবং কোন ধরণের আকাঙ্খা? কামনা-বাসনার তো পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যেমনটি আমি বলেছি, ওয়াক্‌ফে নও-এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি খুব ভালো কথা। এই প্রবণতাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য আরো দৃঢ় করুন। এমন হওয়া উচিত নয় যে, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বীয় অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখিয়ে তা ভঙ্গকারী হবেন!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দুঃখ ছাড়া, কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কুরবানী হয় না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তা সহ্য করতে হবে, বিশেষ করে যারা নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ করেছে অথবা যাদের পিতামাতা স্বীয় সন্তানকে ওয়াক্‌ফ করেছেন এবং পরে তারা নিজেরাও এর নবায়ন করেছে অর্থাৎ আমরা আমাদের ওয়াক্‌ফের অঙ্গীকারে অটল থাকব। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষ যখন খোদার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করেন, তাদেরকে তিনি খালি হাতে রাখেন না, অশেষ ও অঢেল দানে অনুগৃহীত করেন। খোদা তা'লা সকল ওয়াক্‌ফে নও এবং তাদের পিতামাতাকেও ওয়াক্‌ফের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করার আর স্বীয় বিশ্বস্ততার মানকেও যেন তারা উচ্চ থেকে উচ্চতর করতে পারেন, সেই তৌফিক দিন।

সংক্ষেপে কিছু প্রশাসনিক বিষয় এবং জীবন উৎসর্গকারীদের কর্মপন্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিছু কিছু লোক প্রশ্ন তুলে, কোন কোন ওয়াক্‌ফে নও-এর মাথায় এ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, তাদের আলাদা একটি পরিচিতি রয়েছে। অবশ্যই তাদের একটি পৃথক পরিচিতি আছে কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের সাথে স্বতন্ত্র কোন বিশেষ আচরণ করা হবে না বরং এ পরিচিতির সুবাদে তাদের ত্যাগের মান উন্নত করতে হবে। কোন কোন ব্যক্তি তাদের ওয়াক্‌ফে নও সন্তানের মাথায় এ কথা গেঁথে দেয় যে, তোমরা বিশেষ সন্তান। এর ফলে বড় হয়েও তাদের মাথায় এ ধারণাই বদ্ধমূল থাকে যে, আমরা স্পেশাল। এখানেও এ ধরণের কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। এমন ধ্যান ধারণা ওয়াক্‌ফের চেতনা ও মর্মকে খাটো করে আর 'ওয়াক্‌ফে নও' উপাধি লাভ করাকেই তারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে অর্থাৎ আমরা স্পেশাল।

আবার কারো কারো মাথায় এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আমরা যেহেতু ওয়াক্‌ফে নও তাই মেয়ে হলে নাসেরাত ও লাজনা এবং ছেলে হলে আতফাল ও খোদ্দামের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের সংগঠন পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সংগঠন। এ ধারণা যদি কারও মাথায় থাকে তবে তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত

> ওয়াক্‌ফে নওদের কুরবানী বা ত্যাগের মান যেমন উন্নত করা উচিত তেমনি নিজেদের ইবাদতের মানকেও উন্নত করতে হবে, স্বীয় বিশ্বস্ততার মানও উন্নততর করতে হবে। নিজের এবং পিতামাতার কৃত অঙ্গীকার রক্ষার জন্য সকল শক্তি-সামর্থ এবং যোগ্যতাকে ধর্মের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত, ধর্মের সুনাম অক্ষুন্ন ও সমুন্নত রাখতে সদা সচেষ্ট থাকা উচিত। আর তখন আল্লাহ্ তা'লাও স্বীয় দানে ভূষিত করেন। প্রতিদান থেকে কাউকেই তিনি বঞ্চিত রাখেন না।

নিজেদের জাগতিক শিক্ষা অর্জন কালে বিভিন্ন ধাপে নিজেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে জামাতকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কোন পথ অবলম্বন করব? ইতিপূর্বেও আমি বলেছি, জীবন পথ অবলম্বন করার ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফে নও ছেলেরা যেন জামেয়ায় গিয়ে মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ হওয়াকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়।

ধারণা। জামাতের কর্মকর্তা, এমনকি আমীরও বয়সের নিরীখে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংগঠনের সদস্য হয়ে থাকেন।

তাই সকল ওয়াক্‌ফে নও ছেলে এবং মেয়ের স্মরণ রাখা উচিত, তারা তাদের বয়সের নিরিখে স্ব-স্ব সংগঠনের সদস্য এবং তাদের অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেয়া তাদের জন্য আবশ্যক। যারা অংশ নেয় না তাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রেসিডেন্টের রিপোর্ট করা উচিত। সেই ওয়াক্‌ফে নও যদি সংশোধন না হয় তবে এমন সব ছেলেমেয়ে অথবা যুবককে ওয়াক্‌ফে নও-এর স্কীম থেকে বহিষ্কার করা হবে। হ্যাঁ, যদি কোন জামাতী অনুষ্ঠান থাকে, ওয়াক্‌ফে নও বা অংগ সংগঠনের অনুষ্ঠান থাকে, তবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এমন সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, অংগসংগঠনগুলো তাদের অনুষ্ঠান কখন করবে এবং ওয়াক্‌ফে নও কখন তাদের অনুষ্ঠান করবে, কিন্তু সাংঘর্ষিক কোন দৃষ্টান্ত যেন সামনে না আসে। তাই এ বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

যেভাবে আমি বলেছি, ওয়াক্‌ফে নও অবশ্যই স্পেশাল। কিন্তু বিশেষত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য তাদের প্রমাণ করতে হবে, কী প্রমাণ করতে হবে? প্রমাণ করতে হবে, খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী আর তখনই তারা বিশেষত্বের অধিকারী বলে আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে খোদাভীতি যদি অন্যদের চেয়ে বেশি হয় তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের ইবাদতের মান যদি অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হয় তবেই তারা স্পেশাল বা বিশেষ বলে গন্য হবে। তারা ফরযের পাশাপাশি নফলও যদি আদায় করে তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের সার্বিক চরিত্রের মান অত্যন্ত উন্নত মানের হওয়া চাই এটি স্পেশাল হওয়ার একটি লক্ষণ। তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণ অন্যদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত, যাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তারা বিশেষভাবে তরবিয়্যত প্রাপ্ত এবং ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানকারী মানুষ তবেই তারা স্পেশাল হবে।

মেয়ে হলে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পর্দা সঠিক ইসলামী শিক্ষার আদলে হওয়া উচিত, যা দেখে অন্যরাও ঈর্ষা করে এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, সত্যিই এ সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পোষাক ও পর্দা অসাধারণ এক নমুনা বহন করে,তখন এরা স্পেশাল হবে। ছেলে হলে, তাদের দৃষ্টি লজ্জাবনত থাকবে এবং এদিক-সেদিক অনর্থক ও বাজে কাজের প্রতি দৃষ্টি না দিলে তখন স্পেশাল হবে। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃথা ও বাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে সেই সময় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করলে তখন স্পেশাল গন্য হবে। ছেলেদের চেহারা-সুরত যদি অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র প্রমাণ করে তবেই তারা স্পেশাল বলে গন্য হবে।

প্রতিদিন যদি কুরআনের তিলাওয়াত করে এবং এর বিধি-নিষেধ অন্বেষণ করে সে অনুযায়ী আমল করে, তবে এমন ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়েরা স্পেশাল আখ্যায়িত হতে পারে। অঙ্গ সংগঠন এবং জামাতী অনুষ্ঠানে যদি অন্যদের চেয়ে অধিকহারে এবং নিয়মিত অংশগ্রহণ করে তবে তারা স্পেশাল। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের জন্য দোয়ার ক্ষেত্রে অন্য ভাইবোনের চেয়ে যদি অধিক মনোযোগী থাকে তবে এটি তাদের বিশেষত্ব।

বিয়ের সময় ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যদি জগতিকতার পরিবর্তে ধর্মকে অগ্রগন্য করে আর পারস্পরিক সম্পর্কও অটুট ও অক্ষুন্ন রাখে তবে তারা বলতে পারে, আমরা নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণ করে আমাদের সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করি, তবে স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে যদি সহিষ্ণুতাও ধৈর্য্য ধারণের বৈশিষ্ট্য অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে, ঝগড়া-বিবাদ এবং ফিৎনা-ফ্যাসাদকে এড়িয়ে চলে, বরং মীমাংসাকারী হয় তবে তারা স্পেশাল।

তবলীগের ময়দানে সর্বাগ্রে থেকে যদি এ দায়িত্ব পালন করে তবে তারা স্পেশাল। খিলাফতের আনুগত্য এবং তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করার ক্ষেত্রে যদি প্রথম সারিতে থাকে তবে স্পেশাল। অন্যদের তুলনায় যদি বেশি পরিশ্রমী এবং ত্যাগী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল। বিনয় এবং নিঃস্বার্থ হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সবচেয়ে অগ্রগামী থাকে, অহংকারের প্রতি ঘৃণা ও এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে তবে তারা প্রচন্ড রকমের স্পেশাল। এম.টি.এ-এর অনুষ্ঠান থেকে দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য যদি আমার সবগুলো খুতবা শুনে এবং আমার প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখে তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল।

এসব বিষয় এবং আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে

সে সমস্ত বিষয় পছন্দনীয় তার সবই যদি সম্পাদন করে আর যে সব বিষয় আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য সেগুলো থেকে বিরত থাকে তবে তারা শুধু স্পেশালই নন বরং ভীষণভাবে স্পেশাল। অন্যথায় আপনাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পিতামাতাকেও এ কথাগুলো স্মরণ রাখা উচিত এবং এরই আলোকে নিজেদের সন্তানের তরবিয়্যত করা উচিত। কেননা,যদি এসব বৈশিষ্ট্য থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বর্তমান পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়নের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি এরূপ না হয় এবং এ কারণে বিশ্ববাসী আপনাকে অনুসরণ না করে তবে স্পেশাল তো দূরের কথা, নিজ অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় এবং বিশ্বস্ততার উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত না হওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বেঈমান ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

অতএব, তরবিয়্যতের বয়স অতিবাহিত করা কালে এ দায়িত্ব পিতামাতার ওপর বর্তায় যে, তারা যেন তাদের সন্তানকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্পেশাল বানান। আর বড় হয়ে এসব ওযাকফে নও নিজেরাই যেন স্পেশাল হওয়ার এ মার্গ লাভকারী হয়। যেভাবে আমি বলেছি, নিজেদের জাগতিক শিক্ষা অর্জন কালে বিভিন্ন ধাপে নিজেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে জামাতকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কোন পথ অবলম্বন করব? ইতিপূর্বেও আমি বলেছি, জীবন পথ অবলম্বন করার ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফে নও ছেলেরা যেন জামেয়ায় গিয়ে মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ হওয়াকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়। এখন এর অনেক প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। শুধু সেই সব দেশেই নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না যেখানে জামাত দীর্ঘকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত, বরং খোদা তা'লা জামাতকে নতুন নতুন দেশ দান করছেন এবং সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিতও হচ্ছে।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আমাদের অগণিত মুরুব্বী ও মুবাল্লিগের প্রয়োজন। এরপর আমাদের হাসপাতালের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন, পাকিস্তানের রাবওয়াতে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন। কাদিয়ানের হাসপাতালে ডাক্তার প্রয়োজন। এখান থেকে সব দেশে যেতে না পারলেও সারা পৃথিবীর আহমদীরা আমার খুতবা শুনছে, স্ব-স্ব দেশের ওয়াক্‌ফে নওরা যেন এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বড় শূন্যতা রয়েছে।

আফ্রিকাতে ডাক্তার প্রয়োজন। সব বিভাগেরই ডাক্তারের প্রয়োজন। গুয়েতামালায় বড় হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে, সেখানে কানাডা থেকেও যেতে পারে। এখানে ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে। এ চাহিদা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রয়োজন রয়েছে। জামাতের প্রসার এবং বিস্তারের সাথে সাথে এ চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তাই স্পেশালাইজেশন করে, এসব দেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে এবং অভিজ্ঞতা লাভের পর যেসব ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ে ডাক্তারী পড়ছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। আর যেসব দেশে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে সেখানে যাওয়া উচিত। সেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন করলে জামাত তাকে পাঠিয়ে দিবে।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্কুলের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। ডাক্তার এবং শিক্ষক হিসেবে ছেলে-মেয়ে উভয়ই কাজ করতে পারে। কাজেই এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। কিছু সংখ্যক স্থপতি ও প্রকৌশলীর প্রয়োজন, যারা নির্মাণ ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা রাখে, যাতে করে বিভিন্ন মসজিদ, মিশন হাউজ, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির নির্মাণ কাজের সঠিক তত্ত্বাবধান এবং পরিকল্পনা করে জামাতী অর্থ সাশ্রয় করা যায়, অল্প খরচে অধিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া প্যারা-মেডিক্স ষ্টাফের প্রয়োজন রয়েছে, এ ক্ষেত্রেও আসা উচিত। এই হল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যে সব ক্ষেত্রে আপাতত জামাতের (জনবল) প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে অবস্থা অনুসারে চাহিদা পরিবর্তিত হতে থাকবে।

কতক ওয়াক্‌ফে নও কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষন রাখে আর তারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখে সে সব বিষয়ে পড়ার অনুমতিও দিয়ে দেই। কিন্তু এখানে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের এটিও বলব যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার জন্যেও যাওয়া উচিত। ওয়াক্‌ফে নও এবং অন্য সাধারণ ছাত্ররাও এতে অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার ক্ষেত্রে যদি আমাদের ভালো ভালো বিজ্ঞানী হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের শিক্ষক আহমদী হবে এবং জগদ্বাসী ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আপনাদের মুখাপেক্ষী হবে সেখানে জাগতিক জ্ঞানের শিক্ষকও আহমদী মুসলমান হবেন এবং বিশ্ববাসী তাদের মুখাপেক্ষী হবে। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াক্‌ফে নও-রা জাগতিক কাজ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের লক্ষ্য হবে, এসব জ্ঞান এবং কাজের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছেআল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করা এবং তাঁর ধর্মের প্রসার ঘটানো।

একইভাবে ওয়াক্‌ফে নও-রা অন্যান্য বিভাগেও যেতে পারে, কিন্তু মূল এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবার জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় যে, আমি একজন ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী আর যে কোন সময় জাগতিক কার্যকলাপ ছেড়ে দিয়ে ধর্মের প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করতে বলা হলে কোন প্রকার অজুহাত না দেখিয়ে, কোন বাহানা না করে আমি চলে আসব।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সকল ওয়াক্‌ফে নও-এর স্মরণ রাখা উচিত আর তা হল, তাদেরকে জাগতিক কাজে নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি দেয়া হলেও জাগতিক এ কার্যকলাপ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং

ধর্মীয় জ্ঞানার্জন ও ধর্মের সেবা করা থেকে তাদের যেন দূরে ঠেলে না দেয় বরং এ সব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা যেন তাদের নিকট অগ্রগণ্য হয়। কুরআনের তফসীর এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ সকল ওয়াক্‌ফে নও-এর জন্য আবশ্যিক বিষয়। ওয়াক্‌ফে নও বিভাগ সম্ভবতঃ ২১ বছর বয়স সীমা পর্যন্ত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেছে, যার কপি মওজুদও রয়েছে। এরপর আপনারা নিজেরাই আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, এটি খুবই প্রয়োজন।

পিতামাতার উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, তারা তাদের সন্তানকে মৌখিকভাবে যতই তরবিয়্যত করুন না কেন, এর কোন প্রভাব পড়বে না, যতক্ষণ না নিজের কথা ও কর্মকে সে অনুসারে সম্পাদন করবেন। পিতামাতার নামাযের অবস্থা অনুকরণীয় হতে হবে। কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। উন্নত চরিত্রের আদর্শ হতে হবে। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি নিজেদেরকেও মনোযোগী হতে হবে। মিথ্যার প্রতি ঘৃণা পোষণের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কেউ যদি কোন পদাধিকারীর পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পেয়েও থাকে তথাপি বাড়িতে নেযাম অথবা ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এম.টি.এ-তে অন্তত আমার খুতবা নিয়মিত শুনতে হবে।

এ সব কথা শুধু ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের পিতামাতার জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং এমন সকল আহমদী যারা চায়, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন নেযামে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তাদের উচিত তারা যেন তাদের বাড়িকে আহমদী বাড়ি বানান আর দুনিয়ার কীটদের বাড়ি না বানান নইলে পরবর্তী প্রজন্ম বস্তুজগতের পিছনে ছুটতে গিয়ে আহমদীয়াত থেকে শুধু দূরেই যাবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথেও দূরত্ব বেড়ে যাবে আর এভাবে নিজেদের ইহজগত ও পরজগত দুই-ই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

আমার দোয়া থাকবে, সকল ওয়াক্‌ফে নও ছেলেমেয়ে যেন শুধু আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন এবং তাকওয়ার পথে বিচরণকারীই না হয় বরং তাদের আত্মীয়-স্বজনের কর্মকান্ডও যেন তাদেরকে সকল প্রকার দুর্নাম থেকে রক্ষা করার কারণ হয়। বরং সব আহমদীই যেন তেমনই খাঁটি আহমদী হয়ে যায় যেমনটি হওয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বারবার নসীহত করেছেন, যাতে করে আমরা দ্রুততম সময়ে বিশ্বের বুকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পতাকা উড্ডীন অবস্থায় দেখতে পাই।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে আমাদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন, "মানুষ দু'একটি কাজ করে ধরে নেয়, আল্লাহ্‌কে আমি সন্তুষ্ট করে ফেলেছি, যদিও এটি সঠিক ধারণা নয়।" তিনি বলেন, "আনুগত্য অনেক কঠিন একটি বিষয়। সাহাবা (রা.)-এর আনুগত্যই ছিল, সত্যিকার আনুগত্য" যার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি বলেন, "আনুগত্য করা কি সহজ কাজ? যে ব্যক্তি শতভাগ আনুগত্য করে না সে এই জামাতের বদনাম করে। নির্দেশ শুধু একটি হয় না বরং বহু নির্দেশ দেয়া হয়, যেভাবে বেহেশ্‌তের অনেকগুলো দরজা রয়েছে, কেউ একটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে আবার কেউ করে অন্যটি দিয়ে। অনুরূপভাবে, জাহান্নামেরও অনেকগুলো দরজা রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, তোমরা জাহান্নামের একটি দরজা বন্ধ করে অন্যটিকে খোলা রাখলে"! (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪, সংস্করণ ১৯৮৫, লন্ডন)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "বয়আত করার পর মানুষকে শুধু এটি মানলেই চলবে না যে, এ জামাত সত্য আর এতটুকু মানলেই সে কল্যাণমন্ডিত হবে। সৎকর্ম না করে শুধু মেনে নিলেই আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না। এ জামাতে প্রবেশ যখন করেছ, তখন চেষ্টা কর পুণ্যবান হওয়ার, মুত্তাকী হওয়ার, সকল প্রকার পাপ থেকে আত্মরক্ষা করার, কোমল ভাষায় কথা বলার, ইস্তেগফারকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করার এবং নামাযে নিবিষ্টচিত্তে দোয়া করার। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৪ সংস্করণ ১৯৮৫ লন্ডন)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এসব নসীহত মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন পুণ্য ও তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে সফল করে তুলি, আমিন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৪র্থ কিস্তি)

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম

পবিত্র কুরআন বার বার এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার শিক্ষা মানুষের মন ও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম জোর দিয়ে বলে যে, মানবমন বা মানবাত্মার মধ্যে প্রোথিত যে ধর্মের মূল তা স্থান ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। মানবাত্মা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং যে ধর্মের মূল প্রকৃতই মানবাত্মার অভ্যন্তরে প্রোথিত, তা অপরিবর্তনশীল। অবশ্য, যদি তা মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থাদির মধ্যে খুব বেশী জড়িয়ে না পড়ে, তা সে যে কোন যুগই হোক, আর মানুষ যত বেশী প্রগতিই সাধন করুক। যদি কোন ধর্ম, সেই সমস্ত নীতির ওপরে অটল থাকে, যা মানবাত্মা থেকে স্বতঃ উৎসারিত, তবে সেই ধর্মের পক্ষে একটি সাবর্জনীন ধর্মরূপে পরিণতি লাভ করার যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলামের আরও একধাপ অগ্রসর। ইসলাম তার অনন্য অনুধ্যায়ী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এই মত পোষণ করে যে, পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু না কিছু সার্বজনীনতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং, প্রতিটি অবতীর্ণ ঐশী ধর্মে শিক্ষার এমন একটা কেন্দ্রীয় মর্ম পাওয়া যায়, যা কিনা মানবাত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা চিরন্তন সত্য। ধর্মগুলোর এই যে মর্ম, তা অপরিবর্তিত থাকে, যদি না কোন ধর্মের অনুসারীরা পরবর্তীকালে সেই ধর্মের শিক্ষাকে কলুষিত করে ফেলে।

এই বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতেঃ

'এবং তাদেরকে (আহলে কিতাব) এ ছাড়া আদেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই এবাদত করবে, ধর্মকে তারই জন্য বিশুদ্ধ করে একনিষ্ঠভাবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে এবং এটাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম।" (আল্ বাইয়েনাহ্- ৯৮ঃ৬)

'অতএব, তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যার উপরে তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই চিরস্থায়ী ধর্ম কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়'। (আর্ রূম-৩০ঃ৩১)

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে, একই শিক্ষাসহ একের পর এক ধর্ম পাঠাবার যৌক্তিকতা কোথায়? তাছাড়া যে কেউ এই প্রশ্নও তুলতে পারেন যে, যদি সকল ধর্মের শিক্ষাই অপরিবর্তনীয় এবং সার্বজনীন হয়, এবং তা সকল যুগের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য হয় তাহলে ইসলাম কেন এই দাবী করে যে, পূর্ববর্তী সকল ধর্মের তুলনায় তার শিক্ষাই অধিকতর সার্বজনীন এবং বিশুদ্ধ?

(১) প্রথম প্রশ্নটির জবাবে পবিত্র কুরআন মানুষের সৃষ্টি এই অবিসংবাদিত সত্যের প্রতি আকর্ষণ করে যে, কুরআনের পূর্বে যে সকল কিতাব ও ধর্মপুস্তকাদি (সহিফা) অবতীর্ণ হয়েছিল তা সবই মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃত হয়ে গেছে। সেই সকল ধর্ম গ্রন্থাদির শিক্ষাসমূহ ক্রমাগতভাবে সংশোধনীর দ্বারা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। অথবা সেগুলির মধ্যে নতুন নতুন বিষয় প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে, ঐ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপুস্তকের বৈধতা এবং প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং তা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

সুতরাং, কোন ধর্মগ্রন্থে কোন পরিবর্তন সাধন করা না হয়ে থাকলে, তা প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তাবে সেই ধর্মের অনুসারীদের স্কন্ধেই। এ ব্যাপারে, কুরআনের অবস্থান অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপুস্তকাদির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অনন্য। এমনকি ইসলামের অনেক কট্টর দুশমন, যারা বিশ্বাসই করে না যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম (কথা), তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন, সন্দেহাতীতরূপে, ঠিক তেমনই হুবহু এবং অবিকৃত রয়ে গেছে যেমন তা দাবী করা হয়েছে মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক আল্লাহ্‌র কালাম বলে। যেমন স্যার উইলিয়াম মুইর তার Life of Mohamet, (London, 1878), পুস্তকে লিখেছেনঃ There is otherwise every security, internal and external, that we posses the text which Mohamet himself gave forth and used (p.xxvii)

We may, upon the strongest assumption, affirm that every verse in the Quran is the genuine and unaltered composition of Mohamet himself. (p.xxvii)

[Life of Mohamet by SirWilliam Muir (London, 1878)].

Slight clerical errors there may have been, but the Quran of Uthman contains none but genuine elements, though sometimes in very strange order. The efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in the Quran have failed. (Prof. Noldeke in Encyclopadia Brittanica; 9th edition, under Quran.

'মুহাম্মদ নিজে যা দিয়ে গেছেন এবং ব্যহার করে গেছেন, (কুরআনের) সেই টেক্সট্ (পাঠ), যা এখন আমাদের কাছে আছে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, সর্বপ্রকারের নিরাপত্তাই অক্ষুন্ন রয়েছে।' (পৃঃ. ২৭)

'আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই সমর্থন দিতে পারি যে, কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত মুহাম্মদের নিজের খাঁটি ও অবিকৃত রচনা' (পৃ. ২৮)

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে (নবম সংস্করণ), বলা হয়েছেঃ 'অতি সামান্য করনিক (ক্লারিক্যাল) ত্রুটি বিচ্যুতি হয়তো থাকতে পারতো, কিন্তু ওসমানের (সংগৃহীত) কুরআনে তেমন কিছুই নেই, আছে শুধু খাঁটি অংশগুলোই, যদিও কখনও কখনও তার বিন্যাস খুবই অস্বাভাবিক। ইউরোপীয় পন্ডিতদের কুরআনের মধ্যে পরবর্তী কোন প্রক্ষেপের অস্তিত্ব প্রমাণের তাবৎ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।' (প্রফেসর নলডিকিঃ কুরআন)।

বিতর্কের এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এলাকা যে, কোন কিতাব কার দ্বারা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সেই একই কিতাব যার খোদা তা'লা কর্তৃক প্রণীত হওয়াকে সব আহলে কিতাবই চ্যালেঞ্জ করে থাকে, তা এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করছে যে, শুধু তৌরাত ও ইঞ্জিলই (পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচারসমূহ) খোদা কর্তৃক আংশিকভাবে প্রণীত নয়, বরং পৃথিবীর অন্যসব এলাকার অন্যসব ধর্মের অন্যসব কিতাবগুলিও, প্রশ্নাতীতভাবে তদ্রূপ একই খোদা কর্তৃক প্রণীত। যে সমস্ত পরস্পর বিরোধিতা, আজকের দিনে, সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় তা সবাই মানুষের সৃষ্ট। বলা প্রয়োজন যে, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী এ ব্যাপারে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং তা সকল ধর্মের মধ্যে শান্তি স্থাপনে কার্যকরভাবে সহায়ক।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রসঙ্গে, পবিত্র কুরআন মানব সমাজের প্রতিটি পর্যায়ের বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন ধর্মের প্রয়োজন শুধু এজন্যই হয়নি যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মৌলিক শিক্ষা, যা কিনা মানুষের হস্তক্ষেপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল–তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল, বরং সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও নতুন নতুন শিক্ষা দানেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল প্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য।

(৩) এটাই সবকিছু নয়। আর একটা উপাদান এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকে, এবং তা হচ্ছে- সময় সম্পৃক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা, যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল শুধু বিশেষ কোন সময়ের বা মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা মিটাবার উদ্দেশ্যে। এর অর্থ হচ্ছে– ধর্মগুলি শুধু যে অপরিবর্তনশীল নীতিসমূহের কেন্দ্রীয় মর্ম দিয়েই গঠিত, তা নয়। বরং, সেই সঙ্গে সেগুলি এক প্রকার লেবাসী, গৌণ ও পরিবর্তনশীল শিক্ষা দ্বারাও সজ্জিত।

(৪) সবশেষে বলা দরকার যে, মানুষকে একচোটেই ঐশী শিক্ষায় এবং প্রশিক্ষণে শিক্ষিত ও সুদক্ষ করে তোলা হয়নি। বরং তাকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে মনন-চিন্তনে পরিণত করে তোলা হয়েছে, যে পর্যায়ে তাকে তা হেদায়াতের (সৎপথে পরিচালিত হওয়ার) জন্য প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য ও সমর্থ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কুরআনের দাবী মতে, চিরস্থায়ী মৌলিক নীতিসমুহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটা গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষাও অবতীর্ণ হয়েছে চূড়ান্ত, পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম শিক্ষা অর্থাৎ ইসলামেরই একটা অংশরূপেই। যে বিষয়গুলো ছিল স্রেফ স্থানীয় এবং সাময়িক সেগুলো রহিত করা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকী যা সব, অতঃপর, সদা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে, তা সবই রেখে দেওয়া হয়েছে, রক্ষা করা হয়েছে। (দ্রঃ, ৫ঃ১৪-১৬)

এটাই হচ্ছে, আসলে ধর্মীয় সার্বজনীনতার ইসলামিক ধারণা বা কনসেপ্ট। এবং ইসলামের দাবী এটাই। এখন এটা মানুষেরই দায়িত্ব যে, সে বিভিন্ন দাবীকারকের তুলনামূলক গুণাগুণের অনুসন্ধান করবে, বিচার করবে।

এখন, আবারও একবার আমরা সেই সকল ধর্মের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই, যেগুলো নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে বিশ্ব-প্রাধান্য অর্জনের লক্ষ্যে। স্পষ্টতঃই, ইসলাম এরূপ উচ্চাভিলাষকে সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে ঘোষণা করে যে, ইসলাম একদিন মানবজাতির একমাত্র ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে ঃ

'তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সকল ধর্মের ওপরে জয়যুক্ত করে দেন, মুশরেকরা যত অসন্তুষ্টই হোকন না কেন।' (আস্‌সাফ- ৬১ঃ১০)

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি সৃষ্টির অঙ্গীকার সত্ত্বেও, ইসলাম অন্যান্যদের ওপরে প্রাধান্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণী ও আদর্শের প্রতিযোগিতামূলক বিস্তারকে নিরুৎসাহিত করে না। বস্তুতঃ, এরই মাধ্যমে একটি মহৎ লক্ষ্য হিসেবে অন্যান্য সব ধর্মের ওপরে ইসলামের চূড়ান্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এবং এজন্যই ইসলামের অনুসারীদের উচিত ক্রমাগতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.) সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুরআন করীম বলেঃ

"তুমি বল 'হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসূল যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র ওপর এবং তাঁর এই রসূল, উম্মী নবীর ওপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ এবং তার বাণীসমূহের ওপর এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।" (আল্ আ'রাফ- ৭ঃ১৫৯)

যাহোক, পরস্পর সংঘাত ও ভুল বুঝাবুঝি অবসানের লক্ষ্যে, ইসলাম (মানুষের) আচরণেরও একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দান করেছে। যার ফলে, সবার জন্য ন্যায্য ব্যবহার, নিরংকুশ সুবিচার, বাক্-স্বাধীনতা, প্রকাশের অধিকার এবং ভিন্নমত পোষণের অধিকার নিশ্চিত হতে পারে।

(চলবে)

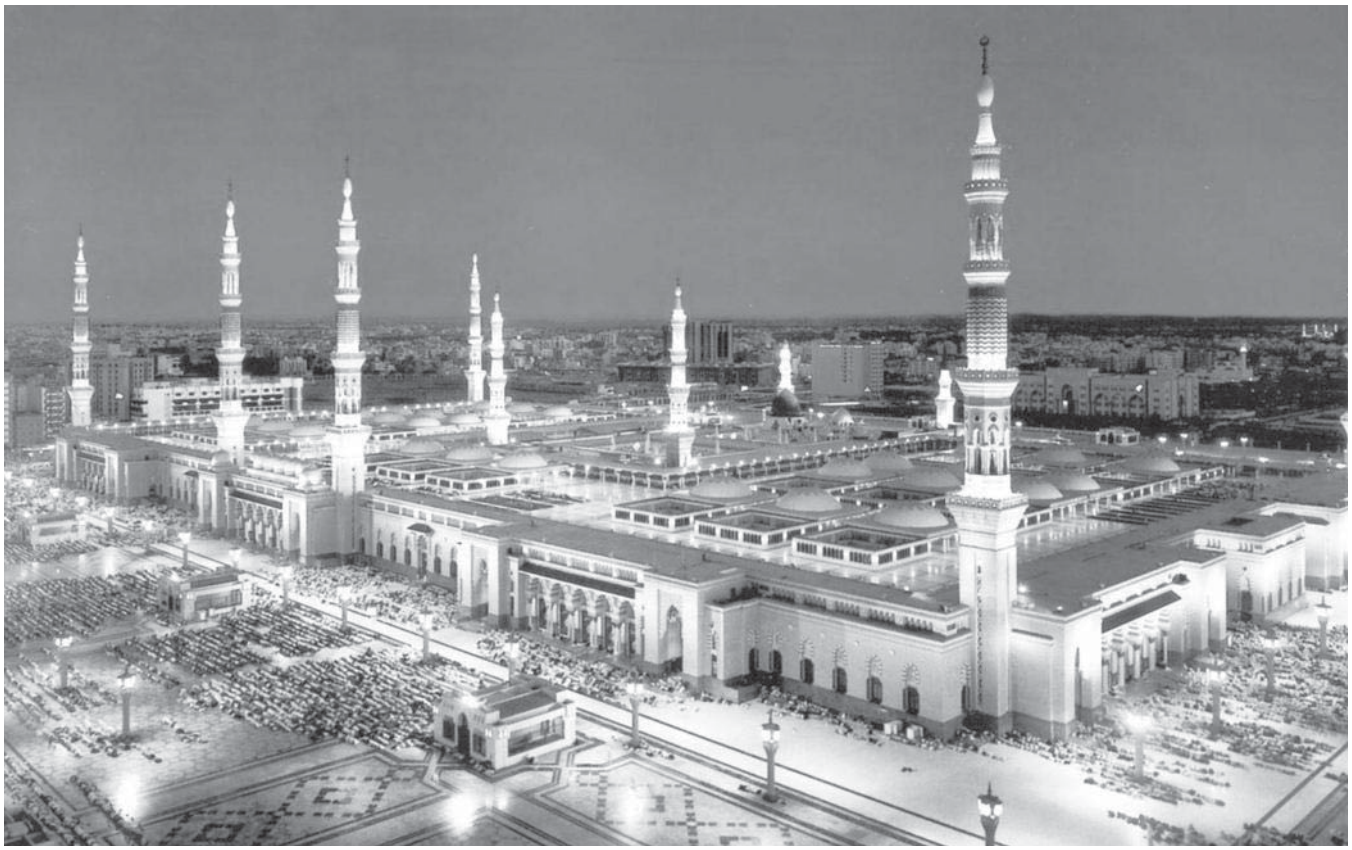

আহ্‌মদীয়াতের দৃষ্টিতে খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর শান ও মর্যাদা

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান
মুরব্বী সিলসিলাহ

মহানবী(সা.)-এর খাতামান নবীঈন-হবার বিষয়ে এবং এর অর্থগত তাৎপর্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী যে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ উন্নত ও অতুলনীয় বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন তা পাঠ করলে যে কেউ অভিভুত হতে বাধ্য। আমি আপনাদের সামনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এর মাধ্যমে আপনারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহানবী (সা.)-এর কী অসাধারণমর্যাদা লালন করে এবং কত উন্নত ভাবধারায়পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমার ধর্মমত হলো, হযরত রসূলুল্লাহ (সা.)-কে পৃথক করে এ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত নবী একত্রিত হয়েও যদি সেই দায়িত্ব ও সংশোধনের কাজ সম্পাদন করতে চাইতেন যা মহানবী (সা.) সম্পাদন করে গেছেন, তাহলে তারা তা কখনই করতে পারতেন না। তাদেরকে সে অন্তর ও সে শক্তিই প্রদান করা হয়নি যা আমাদের নবী (সা.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। যদি এ কথায় কেউ নবীদের বে আদবী মনে করে তবে সেই অজ্ঞের পক্ষ থেকে তা হবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা। আমি সমস্ত নবীদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা আমার ঈমানের অঙ্গ মনে করি। কিন্তু সকল নবীর ওপর হযরত নবী করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব হলো আমার ঈমানের সবচাইতে বড় অঙ্গ, আর এ বিশ্বাস আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। দুর্ভাগা আর দৃষ্টি শক্তি বঞ্চিত বিরোধী যা ইচ্ছা বলূক। কিন্তু আমাদের নবী করীম (সা.) যে কাজ সম্পাদন করে গেছেন তা

পৃথক পৃথকভাবে কিম্বা সম্মিলিতভাবে অন্য কারও দ্বারা সম্পাদিত হতে পারতো না। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ বিশেষ। যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউতীহি মাইয়্যাশা। (মলফুযাত প্রথম খণ্ড, ৪২০)

কী সেই মর্যাদা বা রহস্য যা খাতামান নবীঈনের মাঝে লুকিয়ে আছে? আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"নিঃসন্দেহে, এটি সত্য যে, প্রকৃত অর্থে কোন নবীও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র উৎকর্ষসমূহের সমভাগী হতে পারেন না। এমনকি এক্ষেত্রে ফেরেশতাদেরও সমকক্ষ হবার কোন অবকাশ নেই, আর অন্য কারো পক্ষে মহানবী (সা.)-এর কোন উচ্চতম উৎকর্ষের অংশিদার হওয়া অনেক দূরের কথা। (বারাহীনে আহমদীয়া,১ম খন্ড)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের রসূল (সা.)-এর যোগ্যতা এবং দূরদৃষ্টি সকল উম্মতের যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টির চেয়ে বিস্তর, এমনকি .... সকল নবীর যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি সমান নয়।" (ইযালায়ে আওহাম)

অর্থাৎ নবুওয়াতের সকল উৎকর্ষতা খাতামিয়্যাতের মাঝে নিহিত। আর পবিত্রকরণ শক্তির ক্ষেত্রেও সকল নবী এবং ফেরেশতার সম্মিলিত যোগ্যতা মহানবী (সা.) নিজ সত্তায় ধারণ করতেন। আর এ কারণেই মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এরপর মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "সকল রিসালত ও নবুওয়াত এর উৎকর্ষের পরমত্ব আমাদের নেতা ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় একিভূত হয়েছে।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "বিগত সকল নবুওয়াত এবং ঐশীগ্রন্থাবলীর বিধান এখন আর পৃথকভাবে মেনে চলার প্রয়োজন নেই। কেননা, এর সবই এখন নবুওয়াতে মুহাম্মদীয়ার অন্তর্ভূক্ত। এই পথ ছাড়া বাকী সব পথই রুদ্ধ। এমন সকল সত্য যা পরম উৎকর্ষ লাভের জন্য আবশ্যক তা এতে বিদ্যমান। এর পরে আর কোন নতুন সত্য আসবে না আর এর পূর্বেকার এরূপ কোন সত্য নেই যা এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত নয়। এজন্যই, এই নবুওয়াতের মধ্যে সকল নবুওয়াত খতম করে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পরম উৎকর্ষসহ পূর্ণাঙ্গীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। (আল ওসিয়্যত)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, "আমাদের নবী (সা.) সমস্ত নবীদের উৎকর্ষতার সমষ্টি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ফাবেহুদাহুম ফাক্বতাদেহ অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীরা যেসব নির্দেশানা লাভ করেছিলেন তুমি সেই সবগুলোর ইকতেদা বা অনুসরণ কর। অতএব স্পষ্ট, যে ব্যক্তি এসব সামষ্টিক হেদায়েত নিজের মাঝে আত্মস্ত রাখে তার সত্তা নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ সত্তা সাব্যস্ত হবে এবং সকল নবীর চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হবেন। (চশমায়ে মসীহী)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরম শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "প্রত্যেক জ্যোতি এবং সকল উৎকর্ষতা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকেই লাভ করি। আর এই মাধ্যম ছাড়া খোদার ভালবাসা লাভ অসম্ভব।"

অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাতামান নবীঈনের যে বিস্তর ও সম্মানজনক মহান বিশ্লেষণ দেয় এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর যে বিশাল মর্যাদা ও মাহত্ম উপস্থাপন করে আর কেউ সামষ্টিকভাবে এমন উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উপস্থাপন করে না। তারা রসূল (সা.)-এর খাতামান নবীঈন উপাধীটিকে এত সংকির্ণভাবে উপস্থাপন করে যে কোন সুস্থ্য বিবেকবান এবং যার মাঝে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও প্রেমবোধ আছে সে কিছুতেই তা সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু এমন অতুলনীয় মর্যাদা ও মাহত্ম বর্ণনার পরও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি করা হয় এর মাঝে প্রধান আপত্তি হলো, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাকি খাতামান নবীঈন আয়াত অস্বীকার করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নাকি খাতামান নবীঈন হিসাবে বিশ্বাস করে না। আমি যে উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপন করেছি তাতে যে প্রগাঢ় সত্য ও তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, কেউ যদি ন্যায়পরায়ণ হয়ে এগুলো পড়ে দেখেন তাহলে স্পষ্টই বুঝবেন তাদের আপত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং স্বার্থ মিশ্রিত। এ বিষয়ে এ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ভাষাতেই বলি, তিনি (আ.) বলেছেন, 'আমার এবং আমার জামা'তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) কে খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস করি না এটা আমাদের বিরুদ্ধে ডাহা মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যে প্রত্যয়, দৃঢ়বিশ্বাস ও যে অন্তদৃষ্টি দিয়ে মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া বলে বিশ্বাস করি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অপরাপর লোকেরা মানেন না এবং সেভাবে মানার মত তাদের সেই হৃদয়, ক্ষমতা ও যোগ্যতাও নেই। খাতামুল আম্বিয়া (সা.) এর খতমে নবুওয়াতের মধ্যে যে প্রগাঢ় সত্য ও তত্ত্ব এবং রহস্য নিহিত রয়েছে তা তারা বুঝেনই না। তারা কেবল বাপ দাদার কাছ থেকে একটি শব্দ শুনে রেখেছেন কিন্তু এর প্রকৃত তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অনবহিত। তারা জানেন না, খতমে নবুওয়াত বিষয়টি কি, এর ওপর ঈমান আনার মর্মই বা কি। কিন্তু আমরা পরিপূর্ণ ও সংশয়াতীত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে (যা আল্লাহ্ তা'লা উত্তমরূপে অবগত আছেন) মহানবী (সা.) কে খাতামান

নবীঈন বলে বিশ্বাস করি এবং খোদা তা'লা আমাদের নিকট খতমে নবুওয়াতের গুঢ় তত্ত্ব এরূপ প্রাঞ্জলভাবে খুলে দিয়েছেন, এর গভীর তত্ত্ব ও মর্মের যে সুপেয় শরবত পান করিয়েছেন তাতে এমন এক অনুপম স্বাদ আমরা লাভ করে থাকি যা একই উৎস থেকে পান করে তৃপ্তি লাভকারীগণ ছাড়া অন্য কেউ অনুমানও করতে পারে না।' (মলফূযাত, প্রথম খন্ড: ৩৪২)

প্রশ্ন হলো, কী বিশ্বাস করে আহমদীয়া জামা'ত? আমরা কি খাতামান নবীঈন-এর আয়াত মানি ও বিশ্বাস করি? হ্যাঁ, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা খাতামান নবীঈন আয়াতের সকল অর্থের ওপর ঈমান রাখি, যা কুরআন ও হাদীস সমর্থন করে। আমরা যেভাবে আক্ষরিক অনুবাদ ও অর্থের ওপরেও ঈমান রাখি সেভাবে এর আসল ও মৌলিক অর্থের ওপরও ঈমান রাখি। আর আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি আমরা যে অর্থ করে থাকি তাতেই হযরত রসূল (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। আর এই বিষয়টি আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অর্থ পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে।

আপত্তিকারীরা খাতামান নবীঈন এর অর্থ শেষ নবী করেন। যদি খাতামান নবীঈনের অর্থ শেষ নবী হয় তাহলে ভালভাবে লক্ষ্য করুন, তারা একদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী বলছেন অপরদিকে তারা শেষ যুগে উম্মতে মুসলেমার সংশোধন এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের জন্য হযরত ঈসা নবী উল্লাহ্ আসবেন বলেও বিশ্বাস করেন। যিনি শেষে আগমন করবেন এবং বিশ্ব বিজয় করবেন তাহলে শেষ নবী কে হলেন, হযরত ঈসা (আ.) শেষ নবী সাব্যস্ত হন।

তারা বলেন, যেহেতু ঈসা (আ.) প্রথমেই নবী ছিলেন, তাই তিনি আসতে পারেন। তাদের যুক্তি হলো, জন্মের দিক থেকে বা আবির্ভাবের দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী। যদি আমরা মেনেও নেই তিনি জন্মের দিক থেকে বা আবির্ভাবের দিক থেকে শেষ নবী তবে তাদের আকিদা অনুযায়ী খাতামান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমত: জন্ম বা আবির্ভাবের দিক থেকে মুহাম্মদ (সা.) খাতামান নবীঈন বা শেষ নবী এবং কল্যান, শিক্ষা, বিস্তার, বিজয়, তরবীয়ত, তবলীগ এবং মৃত্যুর দিক থেকে হযরত ঈসা (আ.) খাতামান নবীঈন সাব্যস্ত হন। কুরআন করীম শুধু আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে এমন সম্মানের উপাধী দিয়েছেন অথচ তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই অমূল্য উপাধী হযরত ঈসা (আ.)ও পেয়ে যান। আর এর ফলে মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাহানী হয় আর বনী ইসরাঈলের একজন সাধারণ নবীও মুহাম্মদ (সা.)কে প্রদত্ত উপাধির যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যান। আহমদীয়া জামা'ত মোটেও এটি মানে না। আহমদীয়া জামা'ত কেবল মুহাম্মদ (সা.)-কেই খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস করে এবং একমাত্র উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলে মানে।

কেননা শ্রেষ্ঠত্ব কখনও আগে পরে বা মাঝে আসার সাথে সম্পর্ক রাখে না। শ্রেষ্ঠত্ব গুণ বা বৈশিষ্ঠের কারণে হয়ে থাকে। যদি তাই হয়, দেখুন যদি প্রশ্ন করা হয় মানুষ হবার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব কে? আমরাতো অবশ্যই বলবো হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শেষে জন্ম নিলেই যদি শেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয় তাহলে আজ যে জন্ম নিবে সে পূর্বের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সকলেই জানেন শ্রেষ্ঠত্বের বিচার এভাবে হয় না। যদিও আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের দেড় হাজার বছর আগে এসেছেন, তার মাঝে যে যোগ্যতা ও বৈশিষ্ঠ বিদ্যমান ছিল তিনিই হলেন একমাত্র পূর্ণ মানব তাঁর পূর্বে এমন কোন মানুষের জন্ম হয়নি আর তাঁর পরেও এর চেয়ে যোগ্য কোন মানব জন্মাবে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "যেহেতু মহানবী (সা.) আন্তরিক পবিত্রতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, সততা, নম্রতা, দৃঢ়তা, নিষ্কলুষতা, খোদাভরসা, নিষ্ঠা, খোদা-প্রেমের সব দিক দিয়ে সব নবীদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন এবং সবার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, উচ্চ, সম্পূর্ণ সম্মানিত, অধিক জ্যোতির্ময় ও অধিক নিষ্কলুষ বা মাসুম ছিলেন তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর আতর দিয়ে তাকে সবচেয়ে বেশী সুরভিত করেছেন এবং সেই বক্ষ যা সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর তুলনায় অধিক প্রশস্ত, পবিত্রতর, বেশী জ্যোতির্ময় ও অধিক প্রেমিক ছিল তা এমন ওহী লাভ করার যোগ্য হলো যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী, পূর্ণতর, অধিক উচ্চমানের ও সম্পূর্ণ। " (সুরমা চশমায়ে আরিয়া, পৃষ্ঠা ২৩, ২৪)

খাতামান নবীঈন-এর এমন অনুপম সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কারণেই তো আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতিহি। ইউসাল্লুনা আলান নাবীয়্যি। ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।"**

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্না কা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

দেখুন, এখন আমি আপনাদের সামনে যে দুরুদ শরীফ পাঠ করেছি এতে গভীরভাবে লক্ষ করুন, দেখবেন রসূল (সা.) এর পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখন দেখুন,হযরতইব্রাহীম (আ.) এর পর হযরত ইয়াহ ইয়া (আ.) এসেছেন তাহলে কি পরে আগমনের কারণে হযরত ইয়াহ ইয়া, হযরতইব্রাহীম (আ.)-এর চেয়ে

শ্রেষ্ঠ হবেন? হযরতযাকারিয়া (আ.)হযরত মুসা (আ.) এর পর এসেছেন তাই বলে কি যাকারিয়া (আ.) মুসা (আ.) হতে শ্রেষ্ঠ?না বরং শ্রেষ্ঠত্ব তো গুণে ও বৈশিষ্ঠের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর যদি এমনই বিশ্বাস করেন তাহলে ঈসা (আ.) যিনি কিয়ামতের পূর্ব মুহুর্তে আসবেন তিনি কি পরে আগনের কারণে তার পূর্বেকার সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমানিত হবেন? অতএব বুঝা গেল পরে আসার সাথে কোন শ্রেষ্ঠত্ববা বিশেষত্ব নেই। এ কথা শুধু আমরাই বলছি না বরং পূর্বের বড় বড় বুযুর্গ ও আলেমরা এ কথা বলে গেছেন যেমন-

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানতবী সাহেব তার তাহযীরুন নাস পুস্তকে লিখেছেন,

مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں:۔" عوام کے خیال میں رسول اللہ ﷺ
کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق
کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔
مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت
نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا
اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اس
وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیئے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجئے
تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے مگر
میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہو گی۔
"(تحذیر الناس، صفحہ 4-5)

সাধারন লোকদের ধারণায় রসূল (সা.) এর খাতাম হবার অর্থ হলো তাঁর যুগ পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের পরে এবং তিনি (সা.) সর্বশেষ নবী। কিন্তু বিবেকবান বা জ্ঞানীরা জানেন, যুগের দিক দিয়ে আগে পরে আসার মাঝে কোন আফজালিয়াত বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

এরপর খাতমুল আওলিয়া পুস্তকে বলা হয়েছে– "যারা এর প্রকৃত মর্ম সম্বন্ধে অনবহিত তারা খাতামান নবীঈন এর ব্যাখ্যা করে, তিনি আবির্ভাবের দিক থেকে তাদের সর্ব শেষ বা শেষ নবী। সবার শেষে আগমনের মাঝে কীসের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? সবার শেষে আগমনের মাঝে কোন প্রজ্ঞাটি রয়েছে? এই ব্যাখ্যা বা ধারনা তো কেবল অজ্ঞ ও নির্বোধদের।"

আমাদের কাছে শেষ নবীর অর্থ তাই যা মুহাম্মদ (সা.) নিজে শিখিয়েছেন সহী মুসলিমের কিতাবুল হজ্জে- তিনি (সা.) বলেছেন, 'ইন্নি আখেরুল আম্বীয়ায়ে ওয়া মাসজীদী হাযা আখেরুল মাসাজেদে' আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ আখেরী বা শেষ মসজিদ। এই একটি বাক্যে তিনি তার শেষ নবী হওয়া বুঝিয়ে দিয়েছেন যদি তার মসজিদ শেষ মসজিদ হয়ে থাকে এবং এই মসজিদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরনের উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে শত শত হাজার হাজার মসজিদ নির্মিত হতে পারে এবং এ সত্ত্বেও সেই মসজিদ, মসজিদে নববী আখেরী মসজিদ থাকে তাহলে বুঝা গেল তার আখেরী নবী হওয়া স্বত্ত্বেও তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা কল্পে তার অনুসরণে নবী আসতে পারে। আর যদি আখেরুল আম্বিয়া হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে তার অনুসরনে নবী না আসতে পারে তাহলে আখেরী মসজিদ হওয়ার কারনে এরপর আর মসজিদ নির্মিত হতে পারে না। দেখুন, এখানে রসূল (সা.) আখেরী নবী বা শেষ নবী হবার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা হলো মানুষ যদি নিচ থেকে উপরের দিকে দেখে তাহলে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা এবং উচ্চ মার্গের দিক থেকে শেষে এবং সর্ব উচূতে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

খাতাম শব্দটিকে আরবিতে বলা হয় ইসমে আলা বা যন্ত্রবাচক বিশেষ্য। আর এ কারণেই এর একটি অর্থ করা হয় মহর। অর্থাৎ কোন সীল মোহর যে বিষয়ের সেই সিল মোহর তা-ই অংকন করতে সক্ষম। যেমন কোন সচীবের সীল হলে যেখানেই তাকে লাগানো হবে সেই সচীবের খচিত নাম পদবীই তাতে অংকিত হবে। ঠিক একই ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতাম বা সীল কীসের? সকল নবীর। অর্থাৎ যাতে রসূল (সা.) এর মোহর লাগবে তাতেই পূর্ববর্তী নবীদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ঠ অংকিত হবে। আর যার মাঝে নবীর বৈশিষ্ঠ অংকিত হবে তাকে আমরা নবীই বলবো। এটি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একক গৌরব ও মর্যাদা যা আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে একজন নবীর মর্যাদাও পেতে পারেন। এই অপরূপ ও মহান গৌরবের কথাই আল্লাহ্ তা'লা সূরা নিসার ৭০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করে বলেছেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ
وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করলে চারটি পুরষ্কার রয়েছে নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "এখন মুহাম্মদী নবুওয়াত ছাড়া বাকী নবুওয়াতের সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে। শরীয়তবাহী কোন নবী আসতে পারে না তবে হ্যা শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারে কিন্তু শর্ত হলো, তাকে উম্মতী হতে হবে।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া রূহানী খাযায়েন ২০শ খন্ড পৃষ্ঠা ৪১২) খাতামান নবীঈন (সা.)-এর এ এক অনন্য শান ও মর্যাদা। কিন্তু আপত্তিকারীরা সামান্য বিবেক ও রসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেমবোধ না রেখেই বলে দেন, না, না, নবী হতে পারবে না বরং নবীর সঙ্গী হতে পারবে। কিন্তু ভাবে না ওয়াও-এ আতেফার মাধ্যমে চারটী পুরস্কারকে এক করে দেয়া হয়েছে। কোন একটির পথ বন্ধ করলে বা সব ক'টির পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের কথা মেনে নিলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীরা কেউ-ই নবী, সিদ্দিক, শহীদ, এবং সাধারণ সালেহও হতে পারবে না বরং আগের নবীর এবং তাদের উম্মতের সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহদের সঙ্গি হতে পেরেই নিজেদেরকে ধন্য মনে

করবে। শ্রেষ্ঠ কে হলো? যারা নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ নাকি যারা সঙ্গী হতে পেরেই আনন্দিত তারা? আমাদের বিশ্বাস হলো, আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যার আগমনের পূর্বেই তার খাতামিয়াতের প্রভাবে সকল নবীই নবুওয়াত লাভ করেছিল স্বয়ং সেই মহামহিয়ান খাতামান নবীঈন যখন এই ধরাধামে আসলেন তাঁর অনুসণে অবশ্যই যোগ্য নবী, যোগ্য সিদ্দিক, যোগ্য শহীদ এবং যোগ্য সালেহ হওয়া যায়।

কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন 'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরেযাত লিন্নাস' অর্থাৎ তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত। আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআনের বাণী শুনলেই তারা দৌড়ে হাদীসের দিকে চলে যান, তারা বলেন, রসূল পাক (সা.) বলেছেন, লা নাবিয়্যা বাদি। অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নেই। আমরা কেউ এই হাদীসকে অস্বীকার করি না। আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ যখন বলেছেন তার পর আর কোন নবী নেই আমাদের কারো অধিকার নেই। ঠিক তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলিম শরীফ কিতাবুল ফিতনে আগমনকারী মসীহকে চারবার নবীউল্লাহ্ বলে ডেকেছেন। অর্থাৎ কারো সাধ্য নাই মুহাম্মদ (সা.) প্রদত্ত উপাধি কেড়ে নেয়ার। আপত্তিকারীরা অবলিলায় বলে দেন, উম্মতে মুসলেমার সকল আলেম উলামার ইজমা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর কোন নবী আসতে পারে না।

যেখানে সকল আলেম-উলামা একমত সেখানে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বা এ জামা'তের সদস্যরা যা বলছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট! যদিও আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্র আল কুরআনের আলোকেই মহানবী (সা.)-এর এই পরম উৎকর্ষ প্রমাণ করেছেন এবং বলেছেন একমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-ই সেই সম্মানের অধিকারী যার অনুসরণে নবীর পদমর্যাদাও লাভ করা যায়। কিন্তু এ যুগের আলেম উলামারা কুরআনের কথা কম উল্লেখ করে কেচ্ছা-কাহিনীর উদাহরণ বেশী দিয়ে থাকেন। তাই তারা যে প্রকাশ্য মিথ্যা বলছে এর প্রমাণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তারা বলেন, সকল আলেম উলামাদের ইজমা হলো, রসূল (সা.)-এর পর কোন ধরনের নবী নেই। এখন আমি কয়েকজন সুপরিচিত ও খ্যাতনামা আলেমদের উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) ৫৬০-৬৩৯ ফুতুহাতে মাক্কিয়া পুস্তকে বলেন, সেই নবুওয়াত যা রসূল (সা.)- এর সত্তায় শেষ হয়েছে তা হলো শরীয়তধারী নবুওয়াত, নবুওয়াতের পদমর্যাদ নয়। অতএব মহানবী (সা.)- এর শরীয়ত মুনসূখ করবে এমন কোন শরীয়ত আসতে পারে না, এতে কোন শিক্ষা রাড়াতেও পারেবে না, আর এটাই রসূল (সা.)-এর সেই কথার অর্থ যে, নবুওয়াত ও রিসালত বন্ধ হয়ে গেছে এবং ওয়ালা নাবিয়া বাদী ওয়ালা রাসূলা। অর্থাৎ আমার পর এমন কোন নবী আসবে না যে আমার শরীয়ত ছেড়ে অন্য শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, হ্যা, যদি আমার শরীয়তের অধিনে হয় তবে হতে পারে। আর আমার পর কোন রসূল নাই অর্থাৎ আমার পর দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে এমন কোন শরীয়তধারী রসূল আবির্ভূত হতে পারেন না যে তার শরীয়তের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে। অতএব এই ধরণের নবুওয়াতের দ্বার বন্ধ করা হয়েছে, সকল ধরণের নবুওয়াত নয়। (ফুতুহাতে মাক্কিয়া, খন্ড ২ অধ্যায়-৭৩ পৃষ্ঠা-৩)

আহলে হাদীসের খ্যাতনামা আলেম হযরত নওয়াব নুরুল হাসান খান সাহেব ইবনে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানসাহেব বলেন, হ্যা, আলেমদের নিকট লা নাবিয়া বাদির অর্থ হলো, আমার পর এমন কোন নবী আসবে না, যে শরীয়ত রহিত করে।

হযরত ইমাম শে'রানী (রহ.) লা নাবিয়া বাদি-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তার (সা.)-এর বাণীলা নাবিয়া বাদি ওয়া লা রাসূলা বাদী-এর অর্থ হলো, তার পর কোন শরীয়ত ধারী নবী আসতে পারে না।

বেরলভী ফেরকার সনামধন্য আলেম ও বুযুর্গ মৌলভী আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আব্দুল হাই তার কিতাব দাফেউল ওয়াসাবেস এর ১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর বা তার যুগের পর শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারে কিন্তু নতুন কোন শরীয়তবাহী নবীর দ্বার রুদ্ধ।

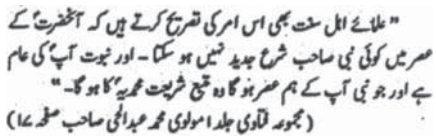
"علمائے اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے عصر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا۔ اور نبوت آپ کی عام ہے اور جو نبی آپ کے ہم عصر ہوگا وہ تبع شریعت محمدیہ کا ہوگا۔"
(مجموعہ فتاوی جلد ۱ مولوی محمد عبدالحی صاحب صفحہ ۱۷)

শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবি রাহে. বলেন, (মৃত্যু ৬৩৮ হি)– মাখলুকের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়ত অব্যহত থাকবে যদিও শরীয়তী নবুওয়াতের দার রুদ্ধ হয়েছে, অতএব শরীয়তবাহী নবী হলো নবুওয়তের একটি প্রকারভেদ।

এরপর ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব শে'রানীর উক্তি শুনুন, ইনি হলেন খ্যাতনামা সুফি বুযুর্গ হিসাবে পরিচিত। তার কিতাব আলইয়াকিত ওয়াল জাওয়াহের একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে এই পুস্তকের দ্বিতিয় খন্ডে ৩৯ পৃষ্ঠায় বলছেন, "জেনে নাও মুহাম্মদ (সা.)-এর পর সকল ধরণের নবুওয়ত বন্ধ হয়নি কেবল মাত্র শরীয়তধারী নবুওয়াতের দ্বার বন্ধ হয়েছে।"

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাশেম নানতবী সাহেব বলেন, মাহনবী (সা.)-এর যুগের পরও যদি কোন নবী আসে এতেও মুহাম্মদ (সা.)-এর খাতামিয়্যাতে কোন প্রভাব পড়বে না। (তাহযীরুন্নাস, পৃষ্ঠা ৩৪)

এ ব্যপারে হানাফী, দেওবন্দী, বেরলভী, মোটামুটি সকল ফিরকার সনামধন্য আলেম ও বুযুর্গ, কুতুবুল আকতাব হযরত

ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দেদ আলফে সানি হযরত শেখ আহমদ ফারুক্বী সারহিন্দী (মৃত্যু ১০৩৪ হি) তিনি তার মাকতুবাতে লিখেন, খাতমুর রুসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পর তার অনুসারীদের তার আনুগত্য ও উত্তরাধিকারী হিসাবে নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা তাঁর খাতামুর রুসুল হওয়ার পরিপন্থি নয়। অতএব তোমরা সন্দেহপোষনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (মাকতুবাত ইমাম রাব্বানী, মাকতুব নম্বর-৩০১ পৃষ্ঠা ৪৩২, প্রথম খন্ড)

এরপর হযরত ইমাম বাকের (রহ.) বলেন, হরযত আবু জাফর ইমাম বাকের (রহ.) আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু-এর ফাকাদ আতায়না আলা ইব্রাহীমাল কিতাবা...এর তফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আলে ইব্রাহীমে রসূল ও আম্বিয়া এবং ইমাম বানিয়েছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মানুষ ইব্রাহীমের বংশে তো নবুওয়াত ও ইমামেতর নেয়ামত লাভের কথা স্বিকার করে কিন্তু আলে মুহাম্মদে নবুওয়াত ও ইমামতের অস্বিকার করে। (আস্‌সাফী শারাহ্ উসুল আল কাফী, খন্ড ৩ অধ্যায়-১ পৃষ্ঠা ১১৯)

মাওলানা রোমী তার এক পক্তিতে বলেন,

নেকীর পথে খেদমতের এমন পরিকল্পনা কর যেন উম্মতের মাঝে তুমি নবুওয়াত পেয়ে যাও। (মসনবী মাওলানা রোম দফতর পঞ্জম পৃষ্ঠা ৪২-কানপূর)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, হে নির্বোধ ও অন্ধরা! আমাদের নবী (সা.) এবং আমাদের সাইয়েদ ও মওলা তার ওপর হাজারো সালাম, স্বীয় উচ্চতর মর্যাদার দিক থেকে সকল নবীকে ছাড়িয়ে গেছেন, কেননা পূর্ববর্তী নবীদের পদমর্যাদা একটি পর্যায় পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল আর এখন সেই সব জাতি, সেই সব ধর্ম মৃত, তাদের মাঝে কোন জীবন নাই কিন্তু মহানবী (সা.)এর আধ্যাত্মিক কল্যান কিয়ামত পর্যন্ত চলমান তাই তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক কল্যান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন মসীহর বাহির থেকে আসার কোন প্রয়োজন নেই কেননা তাঁর অধিনে, তাঁর দাসত্বে পালিত হওয়া এক সাধারণ মানুষকেও মসীহ বানাতে পারে যেমন এই অধমকে বানিয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, তিনি (সা.) খাতামান নবীঈন এই অর্থে নয় যে, তার হতে কোন আধ্যাত্মিক কল্যান পাওয়া যাবে না বরং এই অর্থে তিনি খাতামান নবীঈন কেননা তিনি খাতাম-এর অধিকারী। তাঁর এই মোহর ছাড়া কেউ কোন ধরণের কল্যান লাভ করতে পারে না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার মোহরে এমন নবুওয়াতও লাভ হতে পারে যার জন্য তার প্রথমে উম্মত হওয়া আবশ্যক। (হাকীকাতুল ওহী)

সত্যিই আহদীয়া জামা'ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে যেভাবে খাতামান নবীঈন বিশ্বাস করে এর লক্ষ ভাগের এক ভাগও অন্যরা বিশ্বাস করে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় সত্ত্বার চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন,

"সেই মানব যিনি তাঁর অস্তিত্বে, গুণাবলীতে, কাজে-কর্মে, তাঁর নিরন্তর তৎপরতায় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও পবিত্র বৃত্তি ও শক্তির মাধ্যমে, জ্ঞানে, কর্মে, সাধুতা ও দৃঢ়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানবরূপে অভিহিত হয়েছেন... সে ইনসান যিনি সর্বাপেক্ষা কামেল বা পরিপূর্ণ আর প্রকৃত অর্থেই যিনি পূর্ণ মানব এবং পরিপূর্ণ নবী এবং পরিপূর্ণ আশিস ও কল্যাণ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁর আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থানের ফলে পৃথিবীতে প্রথম কিয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং তাঁর আগমনে একটি মৃত জগৎ পুনর্জীবন লাভ করেছে।" সে কিয়ামত কি ছিল, তা ছিল মৃতদের জীবিত করা। "সে আশিস মন্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, সুফীদের ইমাম, খাতামুল মুরসালীন, নবীদের গর্ব, জনাব মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হে আমাদের খোদা! তুমি এ প্রিয়তম নবীর উপর সে-ই রহমত ও দরূদ বর্ষণ করো যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপরে বর্ষণ করো নি। (ইতমামুল হুজ্জাতে আলাল্লাযী লাজ্জা ওয়া যাগা আনীল মাহাজ্জাতে, রূহানী খাযায়েন-৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর উন্নত মকাম ও মর্যাদা বুঝার তৌফীক দান করুন আমীন। ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে নতুন সংযোজন করা হচ্ছে যে, এখন থেকে সকল আহমদী সদস্য যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক তারা প্রকাশক বরাবর লেখা পাঠাবেন। সেক্ষেত্রে নিম্ন ঠিকানায় লিখতে হবে।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সন্তানদের তরবীয়ত বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

(প্রথম কিস্তি)

আমরা জানি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) শেষ যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও ইসলামের বিজয়ের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা তাঁর (আ.) মাঝে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। বর্তমান যুগের মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত আদর্শকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে মসীহ্ মাওউদ তথা নবী করীম (সা.) এর প্রতিচ্ছায়া করে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা চান যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষাকে অনুসরণ করি। সকল দেশের সকল জাতির সকল শ্রেণীর মানুষের উচিত হুযূর (আ.)-এর শিক্ষাকে মেনে চলা। এতে কারো মান-সম্মান কম হবে না, বরং সকলের জীবন উন্নতমানের জীবন হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন :

"আমি সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপী ব্যক্তির কাজ, আল্লাহ্ আমাকে মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) রূপে পাঠিয়েছেন।" (একটি ভুল সংশোধন পৃ. ৯-১০)

"খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি আমার জামাতকে যেন জানিয়ে দেই, যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যার সাথে সংসার জগতের কোন মিশ্রণ নেই, এমন ঈমান যেখানে কোন ভাবে আনুগত্যের সামান্যতম স্বল্পতা নেই–এমন মানুষেরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন। খোদা বলেছেন, এদের পদক্ষেপ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।" [মাসিক আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া, জুলাই ২০১৬ইং পৃ. ৭]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর রঙে রঙিন করেছেন। অতএব, আমরা নিশ্চিন্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন : মানুষ যেভাবে সন্তান লাভে আগ্রহী আমি তা দেখে আশ্চর্য হই। কে জানে যে, সন্তান কেমন হবে? সন্তান যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তা'হলে মানুষ ইহজীবনে কিছু উপকার পেতে পারে। আর যদি সন্তান এমন হয় যে তার দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল (গ্রহিত) হয় তাহলে পরকালেও উপকার করতে পারবে। অধিকাংশ মানুষ তো চিন্তাই করে না যে, সে কেন সন্তান চায়? আর যারা চিন্তা করে তারা তাদের কামনা-বাসনাকে এতটুকুর মাঝেই সীমিত করে রাখে যে, তার সন্তান তার বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশ বা উত্তারাধিকারী হবে আর বড় মানুষ হবে। সন্তান লাভের আকাঙ্খা করা কেবল তখনই সঠিক হবে যখন ন্যায়পরায়ণ বা সৎকর্মশীল সন্তান লাভের ইচ্ছা হবে। যে সন্তান আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের (দাস) অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যে সকল মানুষেরা নিজেরাই ইহকাল ও সংসার জীবনেই ডুবে থাক তারা এমন ইচ্ছা লালন করবে কখন? মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র ফযল বা অনুগ্রহ চাইতে থাকা; তাহলে আল্লাহ্ করুণাময় ও দয়াবান।" (মলফুযাত, ৪ খণ্ড, পৃ. ২৯৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন : "অনেক মানুষ আছে যারা স্ত্রী-সন্তান লাভ করে এবং স্ত্রী-সন্তানের চিন্তায় নিজেকে নিঃশেষ করে দেয় যেন সন্তানেরা তার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। মানুষ যদি কেবল এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে আর আল্লাহ্‌র জন্য কিছুই না করে তাহলে সে জীবন জাহান্নামের জীবন! এর থেকে সে কী পেতে পারে? সে যখন মারা যাবে তখন সে কী দেখতে আসবে যে, তার বিষয় সম্পদের মালিক কে হল? আর এ থেকে কী কোন আরাম হবে? তার তো কর্মকান্ড সমাপ্ত সে তো আর পৃথিবীতে ফেরত আসবে না। সেতো ইহজীবনে সন্তানদের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে থাকল– জীবনকে জাহান্নামের মত করে যাপন করে গেল!" (মলফুযাত, ৩ খণ্ড, পৃ. ৫৯৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষা হলো, সন্তানদের তরবিয়তের চেষ্টা সন্তান জন্মের পূর্ব থেকেই আরম্ভ করতে হবে। আর সন্তান জন্মের পরে, মা বাবার জীবন প্রণালী ও কর্মকান্ড এমন হতে হবে যেন সন্তানদের জন্য উত্তম নমুনা হয়।

হযরত (আ.) বলেছেন : "সন্তান লাভের আকাঙ্খা কেবল এজন্য হতে হবে যে, সন্তান ধার্মিক হবে, মুত্তাকী (খোদার ভয়-ভীতি) হবে আল্লাহ্‌র অনুগত ধর্মের সেবক হবে। নয়তো সন্তান কামনা বেকার! বরং এক ধরনের গুণাহ্, এক ধরনের অবাধ্যতা... কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি এমন সন্তান চাই, যে ধর্মের সেবা করবে। কিন্তু সে নিজেকে সংশোধন করে না তাহলে তার এমন বক্তব্য অর্থহীন হবে। সে যদি অবাধ্য ও অসৎ জীবন যাপন করে আর মুখে বলে যে, আমি ন্যায়পরায়ন, মুত্তাকী সন্তান কামনা করি তাহলে সে মিথ্যা বলে। যতক্ষণ না সে তার নিজের সংশোধন করে। ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী সন্তান কামনার পূর্বে তার নিজের সংশোধন আবশ্যক। নিজের জীবন যাত্রাকে তাক্ওয়া ভিত্তিক বানানো বেশী জরুরী। তাহলে তার সুসন্তান কামনা ফলপ্রসূ হবে। আর এমন সন্তান **"বকীয়াতুস সালেহাত"** অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ন্যায়পরায়ণ সন্তান রেখে যাবার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে তা পূর্ণ হবে।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৬০)

সন্তান কামনা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। বুদ্ধিমানের কাজ হবে ন্যায়পরায়ণ সন্তান কামনা করা। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারি যে মূলত সুসন্তান কামনা করার মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানোর, নায়পরায়ণ বানানোর উৎসাহ সৃষ্টি হয়। মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, আমার সন্তানকে মানুষ কী বলবে? "অমুকের সন্তান" অর্থাৎ আমি যদি কুকর্মে লিপ্ত হই মানুষ আমাকে নিন্দা করবে। মানুষ আমার সন্তানের প্রতি আংগুল তুলে বলবে যে ঐ দেখ অমুক মন্দ লোকের ছেলে! ধরে নিবে যে আমার ছেলেও মন্দই হবে। আমার সম্পর্কে যদি সমাজে ভাল

ধারণা, ও সুনাম থাকে তাহলে মানুষ আমার ছেলেকেও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখবে। অতএব, আমার সন্তানের ভবিষ্যতকে সামনে রেখে আমার জীবন যাত্রা, আমার কর্মকান্ড, তাক্‌ওয়া ভিত্তিক হওয়া উচিৎ। এর ওপরে খোদা তা'লার কৃপাদৃষ্টি তো আছেই এবং থাকবেও। একথাই কুরআন শরীফে এভাবে বলা হয়েছে ঃ **রাব্বানা... হাবলানা মিন আয্‌ওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুর্‌রাতা আয়ুনিন ওয়াজয়ালনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা"** – হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের জীবন সঙ্গিনী ও সন্তানদের মাঝে আমাদের জন্য চোখের স্নিগ্ধতা ও তৃপ্তি প্রদান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শক বানাও। অর্থাৎ আমাদের সন্তানদের মুত্তাকী বানাও।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন : "মানুষ যখন সন্তান কামনা করে তখন তার নিয়্যত হওয়া উচিৎ **"ওয়া জায়ালনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা"**। তারপর যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন তার ইচ্ছা হবে, আমার সন্তান যেন ইসলাম প্রচারক হয়। এমন সদিচ্ছা যার থাকে, আল্লাহ্ এমন শক্তি রাখেন যে, তার সন্তানকে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর সন্তানের মত বানিয়ে দিতে পারেন।" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৭৯)

এ কথাগুলো কেবল হুযূর (আ.)-এর মুখের কথা নয়। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এর নমুনা লক্ষ্য করা গেছে।

হযরত মির্যা বশির আহমদ (কামরুল আম্বীয়া রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত মুনশী আতা আহমদ পাটওয়ারী (রা.) একের পর তিনটি বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের কয়েক বছর পরেও কোন সন্তান লাভ হয়নি। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খেদমতে লিখলেন, হুযূর, আমার কোন সন্তান হয় না। হুযূর দোয়া করুন, আমার প্রথম স্ত্রীর কোলে যেন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব পাটওয়ারী সাহেব লিখে জানালেন যে, হযরত (আ.) দোয়া করেছেন। এখন আপনি যে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান কামনা করেন আপনি ভাগ্যবান সুদর্শন পুত্র সন্তান লাভ করবেন। শর্ত আপনাকে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর মত তওবা করতে হবে। পাটওয়ারী সাহেব লিখেছেন আমি তো মদখোর এবং আরো অনেক বদ-অভ্যাসের দাস ছিলাম। আমি একজন আহমদীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, যাকারিয়া মাকা তওবা কেমন হয়? তিনি বলেন, তুমি অধর্ম ছেড়ে ধার্মিক হয়ে যাও, হালাল রুটি-রোযী খাও, নামায রোযা করতে থাক, মসজিদে বেশী বেশী যাতায়াত কর। পাটওয়ারী সাহেব লিখেছেন চার পাঁচ মাস পরের কথা। একদিন বাড়ি গিয়ে দেখি বড় গিন্নী কাঁদছে! জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে, কাঁদছ কেন? সে বলল, এতদিন তো সন্তান হতো না, তুমি আরো দুজন সতিন এনে দিলে। এখন তো সবশেষ আর কোন আশা ভরসাও থাকল না। আমার তো মাসিক স্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। সন্তানের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেল। আমি দাইমাকে ডেকে বললাম, দেখ তো আমার স্ত্রীর কি হয়েছে। দাইমা পরীক্ষা করে বলল, 'আল্লাহ্ হয়ত ভুলে গেছেন তুমি বন্ধ্যা! তোমার পেটে তো মনে হয় সন্তান এসেছে!!

আমি তখন স্ত্রীকে বললাম, আমি তো হযরত মির্যা সাহেবের কাছে দোয়া চেয়েছিলাম। কিছুদিন পরে গর্ভধারণ সুস্পষ্ট হয়ে গেল। আমি সবাইকে বলতে আরম্ভ করলাম যে, দেখবে আমার পুত্র সন্তান হবে! সুদর্শন হবে। সবাই আশ্চর্য হল যে, এ কেমন কথা! তারপর সময় মত পাটওয়ারী সাহেবের সুদর্শন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। আব্দুল হক নাম রাখা হল। আব্দুল হক বড় হয়েছেন এবং সাফল্যের সাথে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করে গেছেন। (সীরাতুল মাহদী ১ম খন্ড, বর্ণনা নং ২৪১ পৃ. ২২০-২২১)

এক ব্যক্তির পুত্র সন্তান জন্মের কিছুদিন পরে অসুস্থ্য হয়ে মারা গেল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে নসিহত করে বললেন ঃ

নিয়্যত সঠিক হওয়া চাই নয়ত সন্তান হয়েও লাভ নেই।..... দেখ, হযরত নূহ (আ.) এর পুত্র কোন কাজে আসল না। আসল কথা এই যে মানুষ বিভিন্ন রকম নিয়্যত করে। কারো ইচ্ছা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুরূপ হয় তাহলে আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। আর যে কাজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত হয় না তাহলে মানুষের উচিৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে মেনে নেয়া। (মলফুযাত, ৪ খন্ড, পৃ. ২৯৫)

দ্বিতীয় কথা, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন তা এই যে, মা বাবার উচিৎ সন্তানদের জন্য দোয়া করতে থাকা। বিনা ব্যতিক্রমে দোয়া করতে থাকা আবশ্যক। হুযূর (আ.) বলেছেন :

"আমার নিজের অবস্থা এই যে, আমার এমন কোন নামায নেই যেখানে আমি আমার স্ত্রী-সন্তানদের জন্য দোয়া করি না।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯৫)

হুযূর (আ.) বলেছেন ঃ সন্তানদের পক্ষে মা বাবার দোয়া বিশেষভাবে কবুল করা হয়। আমি নিয়মিত দোয়া করি। প্রথমতঃ আমার নিজের জন্য। আল্লাহ্ দয়াময় আমাকে এমন কাজের সৌভাগ্য দান করুন যদ্বারা আল্লাহ্‌র বিক্রম ও প্রতাপ প্রকাশিত হয় এবং তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তারপর আমার সহধর্মিনীর জন্য দোয়া করি– তিনি যেন আমার চোখের মণি হন, তৃপ্তির কারণ হন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে চলেন। তারপর আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য দোয়া করি। তারা যেন ধর্মের সেবক হন। দূররে সমীনে দেখুন, হুযূর (আ.) সন্তানদের জন্য কেমন দোয়া করেছেন। (মাহমুদ কি আমীন) পুস্তক থেকে এখানে কয়েকটি পংক্তি অনুবাদ সহ উল্লেখ করছি।

সাব কাম তু বানায়ে লাড়কে ভি তুঝছে পায়ে
তুমি সকল কাজ করে দিয়েছ, পুত্র সন্তানও দিয়েছ

সাব কুচ্ছ তেরি আতা হ্যায়, ঘরছে তো কুচ্ছনা লায়ে
সবই তোমার দান– নিজ ঘর থেকে কিছুই সংগ্রহ করিনি

তুনে হি মেরে জানি খুশিয়ুঁ-কে দিন দেখায়ে
তুমিই হে আমার জান! খুশীর দিন দেখিয়েছ

ইয়ে রোয কার মোবারক সুবহানা মাঁই ইয়ারানি
আজকের দিনকে কল্যাণমন্ডিত কর হে পবিত্র খোদা, যিনি আমাকে দেখছেন

কার ইনকো নেক কিসমত দে ইনকো দীন ও দওলাত
এদেরকে ভাগ্যবান পুণ্যবান বানাও, এদেরকে ধর্ম ও সম্পদ প্রদান কর

কার ইনকি খোদ হিফাযত হো ইনপে তেরি রাহ্‌মাত
তুমি নিজেই এদের নিরাপত্তা বিধান কর। এদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষিত হোক

দে রুশদ আওর হেদায়েত আওর ওমর আওর ইয্‌যাত
তুমি এদের হেদায়েত দাও, দীর্ঘজীবি কর সম্মান দাও

ইয়ে রোয কার মোবারক সুবহানা মাঁই ইয়ারানি
আজকের দিনকে কল্যাণমন্ডিত কর হে পবিত্র খোদা, যিনি আমাকে দেখছেন

আয়ে মেরা বান্দা পারওয়ার কার ইনকো নেক আখতার
হে আমার প্রতিপালক! এদেরকে নেক বানাও

রুতবামে হোঁ ইয়ে বারতার আওর বখশ্ তাজ ও আফসার
এরা যেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়, এদের সম্মানের মুকুট প্রদান কর অফিসার নাও

ইয়ে তিনোঁ তেরে চাকর হোয়ে জাহাঁ কে রাহবার
এরা তিন জন যেন তোমার চাকর হয়, দুনিয়ার পথপ্রদর্শক হয়

.....

আহলে ওকার হোয়ে ফখরে দোয়া হোয়ে
এরা যেন সম্মানিত হয়, দেশের জন্য গৌরবের কারণ হয়

হাকক পার নেছার হোয়ে মওলা কে ইয়ার হোয়ে
যেন সত্যের জন্য তারা সবকিছু কুরবানী করে, আল্লাহ্‌র বন্ধু হয়।

.....

দোয়া কারতা হুঁ আয়ে মেরে খোদা
হে আমার খোদা আমি দোয়া করি

না আওয়ে ইনপে রানজোঁ কা যমানা
এদের কাছে কখনো দুঃখ কষ্টের যুগ না আসে।

না ছোড়েঁ উও তেরা ইয়ে আস্তানা
তারা যেন কখনো তোমার দরবার ছেড়ে না যায়

মেরে মওলা! ইনহে হার দাম বাঁচানা–
আমার মালিক! এদের সর্বদা রক্ষা কর

ইয়ে উম্মিদ হ্যায় আয়ে মেরে হাদী–
হে আমার পথ-প্রদর্শক! এটি আমি আশা করি

ফাসুবহানাল্লাযি আখ্‌যাল আয়াদি
তিনিই পবিত্র তিনিই আমার শত্রুদের বেইয্‌যত করেছেন

.....

ইয়ে হো মায় দেখলুঁ তাক্‌ওয়া সবাই কা জাব আবে ওয়াক্‌ত মেরি ওয়াপছি কা
এমন যেন হয়, আমি তাদের সবার মাঝে তাক্‌ওয়া দেখি
আমার যখন প্রত্যাবর্তনের সময় আসে (মৃত্যুর সময়)

অতএব, সব সময় বাবা মা যেন সন্তানদের জন্য দোয়ারত থাকেন। আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমন বলেছেন যে, তিনি প্রত্যেক নামাযে পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করেন। বাল্যকালে জ্ঞান অর্জন সহজ হয়। পড়াশোনা মুখস্ত থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন : "বাল্যকালে স্মরণ-শক্তি বা মুখস্ত শক্তি প্রখর হয়ে থাকে। মানুষের বয়সের অন্য কোন যুগে স্মরণ শক্তি এত প্রখর হয় না..."। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪)

হুযূর (আ.) বলেছেন : "মুসলমানেরা যদি শিশু-সন্তানদের তা'লিম তরবিয়তের প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি না দেয় তাহলে আমার কথা শুনে রাখ, এমন একদিন আসবে যখন সন্তানেরা তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪-৪৫)

তাঁর (আ.) প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীর পূর্বে যখন বেশী ব্যস্ততা ছিল না, হুযূর (আ.) নিজেই তখন সন্তানদের পড়াতেন। হুযূর (আই.) এর প্রথম সন্তান হযরত মির্যা সুলতান আহমদ বলেছেন, বাল্যকালে তাঁর আব্বা তাকে প্রাথমিক লেখাপড়া শিখিয়েছেন। যেমন ফার্সি বই তারিখে ফেরস্তা, গুলিস্তান, বোস্তান, আরবী ব্যাকরণ নাহ্‌ভ, মনতেক ইত্যাদি। সাহেবযাদা সাহেব লিখেছেন, আমি অনেক ভুলো মনের ছিলাম। কিন্তু আব্বা কখনো রাগ করতেন না– মারধরও করতেন না। বারবার পড়াতেন। তবে ধর্মীয় অনুশাসন না মানলে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। (সীরাতুল মাহ্‌দী প্রথম খন্ড, বর্ণনা নং ১৮৬)

হুযূর (আ.) বলেছেন : তোমরা যদি নিজ সন্তানদের খৃষ্টান, হিন্দু, আর্য্য সমাজী তথা বিধর্মীদের প্রভাব থেকে, সংশ্রব থেকে রক্ষা করার চেষ্টা না কর তাহলে মনে রেখ কেবল নিজেদের নয় বরং জাতির প্রতি, ইসলাম ধর্মের প্রতি অবিচার করা হবে। এর অর্থ হবে এই যে, তোমরা ইসলাম বা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ কর না; তোমাদের মাঝে তাঁর (স.) প্রতি ভালবাসা নেই। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫)

(চলবে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের তালীম দপ্তর-এর পক্ষ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তালীম দপ্তর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৬ সালে) ঘোষিত ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় সম্মাননা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। অষ্টম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার জামা'তের কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি এ সম্মাননা পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৭ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
তালীম দপ্তর

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৫৮)

কলমের জিহাদ সম্পর্কিত দৃষ্টান্তমূলক আরো কিছু উদ্ধৃতিঃ ত্রিত্ববাদী খৃষ্ট–ধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীকরণের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ ও মাহদী (আ.) বলেন "একজন খৃষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলে এর ফল কি হবে? এর উত্তর এই যে, পৃথিবী থেকে (ত্রিত্ববাদী) খৃষ্ট–ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" (আহমদী ও অ–আহমদীর মধ্যে পার্থক্য পৃ–৫)। তিনি বলেনঃ "খৃষ্টানদের প্রাধান্যের যুগে মসীহের অবতরনের অর্থ হলো ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান পাদ্রীরাই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল---।" (হামামাতুল বুশরা)। ইয়াজুজ–মাজুজের ফেতনা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "মসীহ মাওউদ ধরাপৃষ্ঠে খৃষ্টানদের আধিপত্যের যুগে আসবেন---তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নিবেন না--- তিনি তাদের সাথে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশাবলীর ভিত্তিতে তর্কযুদ্ধে লিপ্তহবেন এবং উদাসীন সীমালংঘনকারীদের বাহ্যিকভাবে হত্যা করবেন না।" (হামামাতুল বুশরা)। বস্তুতপক্ষেঃ ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপক প্রচার–তৎপরতা বর্তমান যুগে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি দাজ্জালী ফিতনায় পরিণত হয়েছে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে। এই ফিতনার আর একটি দিক হলো ইয়াজুজ–মাজুজের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি–জোটের বহিঃপ্রকাশ যা বর্তমান যুগে যুদ্ধ– বিগ্রহ ও মহাযুদ্ধের আকারে পৃথিবীব্যাপী অভূতপূর্ব ধ্বংসাত্নক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। বহু দলে–উপদলে বিভক্ত মুসলিম সমাজ পরস্পর ফতোয়াবাজী এবং যুদ্ধ–বিগ্রহের জটাজালে আচ্ছন্ন। বিশেষতঃ সাম্প্রতিক জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে–ধর্মের নামে রক্তপাতের ঘটনা নিত্য–নৈমিত্তিক সংবাদে পরিণত হয়েছে। ফলতঃ বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন এই সকল বিপদাবলী থেকে উদ্ধারের ঐশী–পরিকল্পিত উপায় কি?

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ–মাজুজের মোকাবেলা এবং বিশ্বমুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে যুক্তি–জ্ঞান এবং ঐশী সাহায্য–সমর্থনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রচার–তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যেই ঐশী নির্দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বব্যাপী কলমের জিহাদ করে চলেছে বিগত উনবিংশ শতাব্দী থেকে। শত বাধা–বিপত্তি সত্ত্বেও কলমের জিহাদ দ্বারা ঐশী প্রতিশ্রুত পথ ও পন্থার ভিত্তিতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহমদীয়া জামাত উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে সকল প্রকার নৈরাজ্য ও ফিতনার পথ পরিহার করার জন্য। ইয়াজুজ–মাজুজ ও দাজ্জাল সম্পর্কে আরো কিছু উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স নিচে উল্লেখ করা হলো।

১–'দাজ্জাল' শব্দের দুটি প্রধান অর্থ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

'দাজ্জাল' শব্দটির দুটি প্রধান অর্থ হলো ঃ প্রথমত এর দ্বারা এমন একটি দলকে বুঝায় যা মিথ্যাকে সমর্থন করে এবং শঠতা এবং চাতুর্থের দ্বারা কার্য নির্বাহ করতে পারদর্শী। দ্বিতীয়ত এই শব্দটি দ্বারা শয়তানকে বুঝায় – কেননা শয়তান হলো সকল মিথ্যা এবং দূর্নীতির পিতৃ-তূল্য। ... ফলতঃ দাজ্জালের কথা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সেই দাজ্জাল বলতে শয়তানকে বুঝাচ্ছে যাকে শেষ-যুগে বধ করা হবে। এই কথা দানিয়েল পুস্তক এবং হাদীসের বরাতে প্রমাণিত। যেহেতু ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম হলো শয়তানের পূর্ণ প্রকাশিত রূপ , সেজন্য সুরা ফাতেহাতে সরাসরিভাবে দাজ্জালের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের বিপদাবলী থেকে আশ্রয়লাভের জন্য প্রার্থনা শেখানো হয়েছে। যদি 'দাজ্জাল' দ্বারা অন্য কোন দুষ্কৃতিকারীকে বুঝাতো তাহ'লে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে যাল্লীনের দুষ্কৃতি থেকে আশ্রয়-লাভের জন্য নির্দেশ দিতো না–শুধু 'যাল্লীন' দ্বারা দাজ্জালের দুষ্কৃতি থেকে আশ্রয় লাভের জন্য এই দোয়া শেখানো হয়েছে। ... যদি দাজ্জাল দ্বারা ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রচারকারীদের ছাড়া অন্য কাউকে বুঝাতো, তাহলে সেটা স্ব-বিরোধিতার নামান্তর হতো। কারন শেষ যুগে দাজ্জাল পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করবে এবং সেই সময়ে খৃষ্টীয় চার্চের প্রতিপত্তি ও শক্তি অন্যান্য ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। এই স্ব–বিরোধিতার একমাত্র সমাধান হলো এই দুইটি বিষয় এক এবং অভিন্ন।" [রূহানী খাযায়েন, খন্ড -২২ এবং 'হাকীকাতুল ওহী।]

২–'মগযুব' এবং 'যাল্লীন' দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ইঙ্গিত :

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন : "সুরা ফাতেহাতে বর্ণিত দোয়াতে 'মগযুব' ও 'যাল্লীন' এই দুইপ্রকার লোকদের পথ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। 'মগযুব' বলিতে তফসীরকারক মাত্রই 'ইহুদী' বুঝাইয়াছেন এবং 'যাল্লীন' অর্থে (ত্রিত্ববাদী) খৃষ্টানদিগকে বুঝাইয়াছেন। এই উম্মতের জন্য যদি এই বিপদের আসিবার সম্ভাবনা না থাকিত তবে এই দোয়া শিক্ষা দিবার অর্থ কি

? সবচেয়ে বড়ো বিপদ দাজ্জালের আগমনের বিপদ। ... বস্তুত: এই দোয়ার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানী আছে। এই উম্মতের উপর এমন সময় আসিবার কথা ছিল যখন ইহুদীগনের যাবতীয় দোষ মুসলমানদের মধ্যে আসিবে। ইহুদী সেই জাতি , যাহারা হযরত ঈসা (আ.) কে-গ্রহন করে নাই। এখানে ইহুদীগনের পথ হইতে বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য মসীহ মাওউদ (আ.) কে অগ্রাহ্য করিয়া ইহুদী (সদৃশ) না হওয়া। (দ্বিতীয়ত) যাল্লীন অর্থাৎ খৃষ্টানদের পথ হইতে বাঁচিবার জন্য যে প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝ যায় যে, ঐ সময়ে ত্রিত্ববাদী ক্রুশীয় ধর্মের প্রভাব অতি বিপদ-জনক আকার ধারন করিবে। ইহাই যাবতীয় অনর্থের নিদান বা জননী হইবে এবং দাজ্জালের উপদ্রব উহা হইতে স্বতন্ত্র আর কিছুই হইবে না। ['তবলীগে হক' নামক পুস্তক , পৃ-৪৭]

৩-ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান-পাদ্রী এবং ইউরোপীয় বস্তবাদী দার্শনিকরাই দাজ্জালী ফেতনা সৃষ্টিকারী :

অবিশ্বাসীরা, কপটাচারীরা মদ্য-পায়ী নেশাগ্রস্তরা এবং পথভ্রষ্ট মৌলবাদীর দল যাদের কথা ও কাজের মধ্যে সংগতি নেই-এরা সকলেই বর্তমানে যুগে দাজ্জালী মাকড়সার জালের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে । এই মাকড়সার জাল থেকে রক্ষা লাভের জন্য স্বর্গীয় অস্ত্রের প্রয়োজন যা প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। ফলত: সেই প্রতিশ্রুত ঈসার আবির্ভাব হয়েছে এবং ঐশী প্রতিশ্রতি পূর্ন হওয়া অবধারিত ছিল।(বিস্তারিত দেখুন : হযরত মির্যা গোলাম আহমেদ (আ.) প্রণীত কিতাবুল বারিয়া এবং আন্‌জামে আথম নিশান ই-আসমানী, আইয়ামুস সুলেহ ও ইযালায়ে আওহাম প্রভৃতি পুস্তক)।

৪-"ইবনে সাইয়াদ" নামক ব্যক্তির 'দাজ্জাল' হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন :

"সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয় যে,'আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি ইবনে সাইয়াদসহ মক্কার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে সফর করি। ওই সফরকালে ইবনে সাইয়াদ আমাকে বলল, মানুষের অর্থাৎ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের এসব কথায় আমি খুবই কষ্ট বোধ করি যে তাঁরা মনে করেন, আমিই কিনা প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। অথচ আপনারা জানেন, প্রকৃত বিষয় এর বিপরীত। আপনি শোনে থাকবেন যে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দাজ্জাল নিঃসন্তান হবে'। অথচ আমার সন্তান রয়েছে। তাছাড়া রসূল করীম (সা.) বলেছিলেন, 'দাজ্জাল' 'কাফির' (অমুসলিম) হবে।' অথচ আমি একজন মুসলমান। তিনি (সা.) আরও বলেছিলেন যে দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ আমি মদীনা থেকে এসেছি এবং মক্কায় যাচ্ছি।

---- আর এ স্থলে অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম মুসলিম লিখেছেন, প্রতিশ্রুত দাজ্জালের কপালে কাফ-ফে-রে (কুফর) লেখা থাকবে। কিন্তু এই দাজ্জাল (ইবনে সাইয়াদ)-তো মুসলমান হওয়ার মর্যাদা লাভ করলো। অতঃপর ইমাম মুসলিম লেখেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিশ্রুত দাজ্জাল প্রবল বায়ু দ্বারা পরিচালিত মেঘপুঞ্জের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিম ঘুরে ফিরবে।' কিন্তু এই দাজ্জাল (ইবনে সাইয়াদ) মক্কা থেকে মদীনায় যখন ফিরে গেল তখন হযরত আবু সাঈদ খুদরি অন্যদের চেয়ে বেশী চলতে পারে নি। কেননা মুসলিম বর্ণিত হাদীস থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

তেমনিভাবে কেউ তার কপালে কাফ-ফে-রে লেখা দেখতে পান নি। ইবনে-সাইয়াদের কপালে কাফ-ফে-রে (কুফর) লেখা থাকলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করতে হযরত উমর (রা.)-কে কেন-ই-বা নিষেধ করতেন এবং কেনই বা বলতেন, "তার (প্রকৃত) অবস্থা সম্পর্কে আমার এখনও সন্দেহ আছে। প্রতিশ্রুত দাজ্জাল যদি এ ব্যক্তিই হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য ঈসা-ইবনে-মরিয়মই (আল্লাহ্ নির্ধারিত) সেই ব্যক্তি যিনি তাকে হত্যা করবেন। আমরা একে হত্যা করতে পারব না!" [বিস্তারিত দেখুনঃ 'ইযালায়ে আওহাম' নামক পুস্তক]

৫- ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন :

'আযীয' বা আগুনের ব্যপক ব্যবহার-কারী এবং পৃথিবীব্যাপী প্রবল-প্রতাপশালী ক্ষমতাধর দুটি জাতির অভ্যুদয়ের বর্ণনা সম্পর্কেবিস্তারিত জানার জন্য লেকচার শিয়ালকোট, আইয়ামুস সুলেহ, চশমায়ে মারিফাত প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। আগুনের সর্বাধিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমুহ এবং এই অবস্থা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাবের বিশেষ চিহ্ন-স্বরূপ উল্লেখ করতঃ তিনি বলেনঃ

"আমি প্রমাণ করেছি যে, ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাবের যুগে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন হওয়া আবশ্যক। যেহেতু 'আযিয' শব্দটি থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দদ্বয় উৎপন্ন হয়েছে, সেজন্য আল্লাহ তালা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ এমন জাতি যারা আগুনের ব্যবহারে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী যা ইতিপূর্বে কোন জাতির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তাদের ঐ নামকরণ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তাদের আবিস্কৃত জাহাজ, রেলগাড়ি এবং যন্ত্রপাতি, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি মূলত আগুন দ্বারাই চালিত হয়। তাদের যুদ্ধগুলিতেও তারা আগুনের বহুল ব্যবহার করবে। মোটকথা তারা বিভিন্ন কাজে এবং উদ্দেশ্যে আগুনের ব্যবহারে অন্যান্য সকল জাতির তূলনায় অধিকতর পারদর্শী হবে। এজন্য তাদেরকে ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হবে। এরা হলো পশ্চিমা দেশের অধিবাসী এবং তারা আগুনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পারদর্শিতা অর্জন করেছে।ইহুদী ধর্মগ্রন্থেও তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ইউরোপের এবং রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এটা পূর্ব-নির্ধারিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ আবির্ভূত হবেন ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের সময়-কালে।" [আইয়ামুস-সুলেহ]

৬- ইয়াজুজ-মাজুজের যুদ্ধ-ক্ষমতার ভয়াবহতা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

"যেভাবে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে ইয়াজুজ ও মাজুজের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সমকক্ষ হতে পারবে না। এমন কি প্রতিশ্রুত মসীহ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে শুধু প্রার্থনার দ্বারাই মোকাবেলা করবে। এই সকল বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। পবিত্র কুরআনও এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করত: ঘোষনা করেছে : "ওয়া হুমমিন কুল্লে হাদাবিন ইয়ানসেলুন"। (তারা প্রত্যেক উচ্চতা থেকে তড়িৎ গতিতে ধাবিত হবে। সূরা আল-আম্বিয়া ২১ঃ৯৭)। [চশমায়ে মারেফাত]

(চলবে)

ধর্ম আর বিজ্ঞানের মিলনেই হবে বিশ্বের কল্যাণ

(নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালাম স্মরণে)

নেছার আহমদ

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে কব্জা করে বিজ্ঞানের আবিস্কার সমূহকে অপব্যবহার করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য পাশ্চাত্য জোট যেভাবে মানবতাকে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে তাতে শান্তিকামী মানুষ আজ বিজ্ঞানের নব উত্থানের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রফেসর হাকসলী বলেছেন, True science and true religion are twin sisters and the seperation of either from the other is sure to prove the death of both (Education, by Spencer, page-50) অথাৎ প্রকৃত ধর্ম এবং প্রকৃত বিজ্ঞান পরস্পর যমজভগ্নীর ন্যায়। এর একটি হতে অপরটির বিচ্ছিন্নতা উভয়ের মৃত্যু ডেকে আনবে।

সত্যি আজ একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার সময়ে পশ্চিমা বিশ্বের দাজ্জালীয় শক্তির হাতে মুসলিম বিশ্ব তথা মানবতা ধ্বংস হতে চলেছে। তারা বিজ্ঞানের অপব্যবহারের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে কব্জা করতে চায়। দাজ্জালীয় শক্তি তার বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার অহংকার ও বৃহৎ শক্তির গরীমায় মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্তান সহ সমগ্র বিশ্বে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে বা চালাচ্ছে, তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। তাদের ধ্বংসযজ্ঞ হতে মানব সভ্যতার হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য, পুরাকীর্তি কোন কিছুই রক্ষা পাচ্ছেনা। প্রজন্মকে মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে, অতিশয় সুপরিকল্পিত পরিকল্পনায় পশ্চিমা বিশ্ব এসব ধ্বংসযজ্ঞ একের পর এক মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে। ইরান, কুয়েত, আফগানিস্তান, ইরাক এরপর সিরিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতির নাম ধ্বংসযজ্ঞের তালিকায় স্পষ্টই দৃশ্যমান।

ইতিহাসের ক্রান্তিকালে বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুসলিম বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামের জীবনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য অংশ ও তার বক্তব্য ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে তার অবদান ও তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জন্য তার কীর্তিসমূহ অতি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী মুসলিম ধার্মীক বিজ্ঞানী প্রফেসর সালাম মানবতার কল্যাণে সারাটি জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। স্বাভাবিকভাবে এ মহান বিজ্ঞানীর কর্মময় জীবন সকলেরই জানা প্রয়োজন।

১৯০১ সালে মহান বিজ্ঞানী আলফ্রাড নোবেল কর্তৃক নোবেল পুরস্কার চালু করার পর আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম বিজ্ঞানী এ পুরস্কার পাননি। সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নিজস্ব মেধা ও গবেষণার ফসল হিসেবে ১৯৭৯ সালে প্রথম মুসলিম হিসেবে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন পাকিস্তানের খ্যাতনামা মুসলিম বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম এ বিজ্ঞানী ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করতে ঢাকায় এসেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ মহান বিজ্ঞানীর সাথে পরিচিত হয়েছি এবং তার অটোগ্রাফও নিয়েছি। চট্টগ্রাম সফরকালে তার সাথে একান্তে বসার ও কোলাকোলি করার সুযোগও আমার হয়েছে। খুবই কাছ হতে তাকে জানার, দেখার সুযোগ হওয়ায় আজও আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। চট্টগ্রাম সফরকালে তাঁর সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী চট্টগ্রামের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম। যিনি প্রফেসর সালাম সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের সাথে আলাপচারিতায় প্রফেসর সালামের বিষয়ে অনেক অনেক স্মৃতির-কথা বলেছেন। যা পুলকিত করে।

পৃথিবীতে প্রথম মুসলমান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সালাম সাহেব ইটালীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন International Centre for Theoretical Physics যাতে তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী ছাত্রদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তার কর্মে ও গবেষণার বিষয়বস্তুতে এবং চিন্তা চেতনার বিভিন্ন পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের তথা অনুন্নত বিশ্বের মুসলিমদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশী। তিনি তার বক্তব্যে সর্বদা বলেছেন, "৭৫০ হতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলাম অসমান্য অবদান রেখেছে। কিন্তু ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পর হতে ইসলামের আর কোন অবদান নেই। ...নোবেল পুরস্কার প্রর্বতনের পর হতে এ পুরুস্কারের ৩৮ শতাংশই পেয়েছে ইহুদিরা। অথচ সারা বিশ্বে ইহুদীদের সংখ্যা মাত্র এক কোটি। আর মুসলমান রয়েছে একশ কোটিরও অধিক। এছাড়া বাংলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা ৯ কোটিরও উপরে। [সূত্র-বিচিত্রা- ২৩ জানুয়ারী সংখ্যা- ১৯৮১ ইং]

মানবপ্রেমী প্রফেসর আব্দুস সালাম নোবেল পুরস্কারের লব্ধ পুরো অর্থই বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মেধাবী ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি তহবিল গঠনে দান করে দিয়েছেন। কাঁচাপাকা শ্মশ্রুমন্ডিত সৌম্য চেহারার প্রফেসর সালাম যে কতটা বিনয়ী এবং প্রাজ্ঞ তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ভারী চশমার কাঁচের আড়ালে অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। ধর্মভীরু, বক্তৃতায় প্রায়শ পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ ও পূণর্জাগরনের কথা সমূহ তার বক্তৃতা জুড়ে থাকবেই। তেমনি একটি বক্তৃতা এখানে তুলে ধরছি।

তিনি বলেন, "... আমার বক্তব্যকে সুদৃঢ় করার জন্যই আমার নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করার সময় দেয়া বক্তৃতায় বলেছিলাম, "জর্জ সার্টন তাঁর পাঁচ খন্ডের বৃহদাকার বিজ্ঞান ইতিহাসের বইয়ে বিজ্ঞানের গৌরবময় আবিস্কার সমূহকে কালের দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। সময়-কালের প্রতিটি ভাগ অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ব্যপ্ত। প্রতি অর্ধশতাব্দীতে বিজ্ঞান আবর্তিত হয়েছে একজন কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে। এভাবে খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ হতে ৫০০ অব্দ পর্যন্ত ছিল প্লেটোর যুগ। এরপর আসে এ্যারিষ্টোটল, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় চরিত্রের যুগ। ৫০০ হতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ ছিল ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্রের যুগ। এসময়ে বিজ্ঞানে প্রাধান্য বিস্তার করে প্রাচ্য। ৬০০ হতে ৭০০ খৃষ্টাব্দ ছিল চীনা বিজ্ঞানীদের যুগ। এ সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানী মার্কভট্ট, গনিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত প্রাধান্য বিস্তার করেন। এরপর ৭৫০ হতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সু-দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর ব্যাপী ব্যাপ্ত ছিল মুসলমান বিজ্ঞানীদের স্বর্ণময় যুগ।"

বিজ্ঞানী জাবের, খারেজমী, রাজী, মাসুদী, আলবেরুনী, ওমর খৈয়ামের স্বর্ণকাল ছিল এসময়। এরা সবাই ছিলেন ইসলামী ঐতিহ্যের অধিকারী। ওমর খৈয়ামের সমসাময়িক ভারতীয় পুশ্চকরাচার্য প্রতিভার দিক দিয়ে ওমর খৈয়ামের সম-পর্যায়ের ছিলেন। ১১০০ সাল থেকে আমাদের পতন ও পাশ্চাত্যের উত্থানের সূচনা হয়। ১৩৫০ হতে এপর্যন্ত প্রাচ্যে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিভা দেখা যায়নি। মাঝেমধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো দু'একজন আর্বিভূত হয়েছেন। যেমন ১৪০০ সালে উনুলবেগ, ১৭২০ সালে মহারাজা জয়সিং। এরপরে আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিভা নেই। এ শব্দাতীতে সি. ভি. রমন, এস এন বোস এবং এম এন সাহা অন্যতম। এখন প্রশ্ন হলো মুসলমানরা এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ ১৩৫০ সালের পরে বিজ্ঞান জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো কেন? মুসলমানদের পতনের জন্য মঙ্গোলীয় আক্রমনকে দায়ী করা হয়। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মঙ্গোল আক্রমন মুসলমানদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পতনের কারণ হলেও, অভ্যান্তরীন বিবিধ কারণও এর জন্য দায়ী। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক 'ইবনে খালদুন' হতে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তিনি ১৩০০ সালের দিকে বলেছেন, 'ফ্রাঙ্ক ভূমি ও ভূমধ্য সাগরের উত্তর উপকুল বরাবর ফিলসফিক্যাল সায়েন্স প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। একই বিজ্ঞান বার বার চর্চা করা হয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে শেখানো হয়েছে এবং এই ফিলসফিক্যাল বিজ্ঞানের প্রসার ছিল ব্যাপক ও বহুল চর্চিত। ... দুঃখের বিষয় সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ঐতিহাসিক সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিদ্ খালদুন বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছেনা বলে কোন রকম আক্ষেপ প্রকাশ করেননি। আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গুরুত্বহীন বলে মনে করা হতো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যুৎপুত্তি লাভের জন্য সমগ্র জাতিকে আগে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শুধু একজন স্কলারের বক্তব্য শুনলেই চলবেনা আপনাদের। নিজেদের নিজস্ব মেধা ও অনুশীলন করতে হবে। নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের স্বর্ণময় যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠতার কারণ হলো তাঁরা পবিত্র কুরনের আদেশ অনুসরণ করতেন। ক্বারী সাহেবের তেলাওয়াতে যা উচ্চারিত হতো তাঁরা সে অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। কিন্তু বর্তমানে ধনে-মানে মুসলমানরা অগ্রগামী হলেও বিজ্ঞান শিক্ষায় তারা অনেক অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। ফলে আজ তারা রয়েছে অন্ধকারে। পবিত্র কুরআনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দামেস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মোহাম্মদ এজাজ আল খতিবের মতে পবিত্র কুরআনে ২৫০টি আয়াতে বিজ্ঞানের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং ৭৫০টি আয়াতে মোমেনদের জন্য বিজ্ঞান চর্চা, প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন ও যুক্তিতর্ক ভিত্তিক বিশ্লেষণের আদেশ দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষা সমূহ যা পবিত্র কুরআনের এক অষ্টমাংশ জুড়ে বিস্তৃত।

বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম ও গবেষণা সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রেক্ষিতে হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **"ইন্না মান উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া" অর্থাৎ নবীর উত্তরাধীকারী তারাই, যারা জ্ঞান চর্চা করে থাকেন"**। ইলম অর্থ জ্ঞান। এখানে উল্লেখ্য যে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে "ইলম বা জ্ঞান চর্চাকে ধর্মীয় জ্ঞানার্জন বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু আরবরা কখনোই ইলমের অর্থ এভাবে করেন না। ত্রিপোলীর আল ফাতাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ মনতাসার এর মতে "ইলম" শব্দের অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞান আর এর চর্চা যারা করেন অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা হলেন হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর উত্তরাধীকারী। এই বিষয়টি আমি আপনাদের স্মরণ রাখতে বলছি। ...এ প্রসঙ্গে আমি বলছি, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের শ্লোগান ছাপা হয়েছে। "আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে চীনকে ছাড়িয়ে যাব"। আমি বাংলাদেশকে এই শ্লোগানটি উপহার দিয়ে বলতে চাই যে, **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের চেয়ে এগিয়ে যান"**।

সর্বশেষে আমি বলতে চাই, আজকের এ মহতী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পদার্থ বিজ্ঞানের গুরুত্বের উপর আমি যে বক্তব্য রাখলাম, তা যদি সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আমার এ আহ্বান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। নতুন হিজরীর প্রারম্ভে আমার দোয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব হতে দারিদ্র যেন দূরীভূত হয়। [সূত্র- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ শে মাঘ ১৩৮৭ সাল]

বর্ণিত বক্তৃতাটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রফেসর সালাম সাহেবের দেয়া বক্তব্যের অংশবিশেষ। এ বক্তব্যের মাধ্যমে মহান ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর প্রকৃত পরিচয় সকলের নিকট উম্মোচিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মানুষকে ভালবাসতেন বলে সময় সুযোগ পেলেই তিনি বাংলাদেশে ছুটে এসেছেন। এখানে এবিষয়ে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৬ এপ্রিল ৯৬ ইং তে বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্স এর উদ্যোগে প্রফেসর সালাম সাহেবের ৭০ তম জন্ম বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে উপস্থিত খ্যাতনামা বক্তরা বলেন, "তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি এবং ট্রিয়েস্তি আর্ন্তজাতিক বিজ্ঞান একাডেমীর পরিচালক প্রফেসর সালাম আজীবন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের খুবই পছন্দ করতেন"। এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,

বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতি ডঃ এস ভি চৌধুরী, জাতীয় প্রফেসর এম ইন্নাস আলী, প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ, ডঃ এ. এম চৌধুরী, ডঃ এম আর চৌধুরী এবং পরমানু শক্তি কমিশনের সদস্য ভৌত বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া। তারা বলেন অধ্যাপক সালামের লন্ডনের বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে কোরানের আয়াত লেখা রয়েছে যা তিনি প্রত্যহ চর্চা করেন। অধ্যাপক সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত বিজ্ঞানের ছাত্রদের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্রদের সমমর্যাদা দিতেন। [সূত্র-পরমাণু পরিক্রমা, এপ্রিল জুন-সংখ্যা ১৯৯৬]

এ মহান বিজ্ঞান সাধক বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "বিজ্ঞান এবং ইসলাম ধর্মে কোন বিরোধ খুঁজে পাইনি, আল্লাহ বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্য্য (বিউটি), সামঞ্জস্য (সিমেট্রি), হারমনি (ইকুইটি) তথা সমতার আইডিয়া দিয়ে। এর সঙ্গে রয়েছে রেগুলেরিটি। এখানে কেওসের (Chaos) কোন স্থান নেই। কুরআন প্রাকৃতিক সূত্রগুলোর উপর বার বার জোর দিয়েছে। আমার বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনায় তাই ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহ কি ভেবেছেন আমরা তাই অনুসন্ধান করে বোঝার চেষ্টা করছি। অবশ্য তার পরিকল্পনার অতি নগণ্যই আমরা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা যতটুকু বিশ্লেষণ করে উদঘাটন করতে পেরেছি তার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার সত্যতা দেখে তৃপ্ত হয়েছি। আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে চাই। ৭৫০ হতে ১২০০ সাল পর্যন্ত ছিল ইসলামিক বিজ্ঞানের জগৎ। তখন বিজ্ঞানের আধিপত্য ছিল মুসলমানদের হাতেই এবং আমি সেই স্বর্ণযুগের ঐতিহ্য ধারণ করে এগিয়ে চলেছি। [সূত্র-সাপ্তাহিক রোববার, ১৯ অক্টোবর ১৯৮০ সংখ্যা]

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছিলেন, "Science without religion is lame and religion without science is blind" আইনষ্টাইনের এ বক্তব্যের সত্যতার নিদর্শন হচ্ছেন একমাত্র নোবেল প্রাইজ বিজয়ী ধার্মিকতার অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্রফেসর আব্দুস সালাম। যে বিষয়ে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তার জীবনের শেষ ৩৫ বছর কাল সাধনা করে ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেই একই বিষয়ে গবেষণা করে প্রফেসর সালাম ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন। বিষয়টি হচ্ছে, **"প্রকৃতিতে চারটা বল রয়েছে। এগুলো হলো মধ্যকর্ষ 'বল', তড়িৎচুম্বকীয় বল, শক্তিশালী ও দুর্বল পারমাণবিক বল। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এবং আইনষ্টাইন ও অনেককাল ধরে চেষ্টা করেছেন বলগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখানোর অর্থাৎ চারটি বলই যে আসলে এক এবং এর ভিন্ন ভিন্ন চারটি অবস্থান রয়েছে, তা প্রমাণ করা। প্রফেসর সালাম ঐ চারটি বলের মধ্যে দু'টো বলকে এক দেখাতে পেরেছেন। বাকীগুলোকে অভিন্ন দেখানোর চেষ্টা তিনি করছেন।** [সূত্র- দৈনিক ইত্তেফাক ১৮ মাঘ ১৩৮৭ সংখ্যা] অর্থাৎ তিনি "দুর্বল পারমানবিক বল ও বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বল" এ দুটিকে পারস্পরিক সম্পর্কিত করে এক-নিয়মের অধিনে নিয়ে আসার জন্য পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বিজ্ঞানী আব্দুস সালামকে নিয়ে লিখতে গেলে হয়ত কয়েকটি মহাগ্রন্থই রচনা করা আবশ্যক হবে। তবুও আমি তার জীবনের সামান্য অংশ এখানে তুলে ধরছি। আমার জানামতে প্রফেসর সালাম সাহেবকে নিয়ে প্রায় হাজারো পৃষ্ঠায় একটি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল যা সম্ভবত ডঃ হারুন অর রশিদ সাহেব সম্পাদনা করেছেন, এ বৃহৎ পুস্তকটি আমি পড়েছিলাম। এ বইটিতে বিভিন্ন সময়ে প্রফেসর সাহেবের বক্তব্য, বক্তৃতা, বিবৃতিসমূহ সংকলন করা হয়েছে, বইটি এখন দুস্প্রাপ্য। এখানে মহান বিজ্ঞান সাধকের জীবন চরিত্রের ঘটনাপঞ্জি সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরছি।

প্রফেসর আবদুস সালাম ঃ

জন্ম ঃ ২৬ শে জানুয়ারী, ১৯২৬ ইং।

জন্মস্থান ঃ জং, পাকিস্তান।

মৃত্যু ঃ ২১ শে নভেম্বর ১৯৯৬ ইং।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ঃ

১৯৩৮ হতে ১৯৪৬ পর্যন্ত লাহোর ও জং এর সরকারী কলেজ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ অনার্স ও ডবল ফাষ্ট গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে। ফাউন্ডেশন স্কলার, সেন্ট জন্স কলেজ ক্যামব্রিজ।

পুরস্কার সমূহ ঃ জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কার এখানে তুলে ধরছি–

১। হপকিন্স প্রাইজ (ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৫৭-১৯৫৮

২। পদার্থ বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্য এডামস প্রাইজ (ক্যামব্রিজ) ১৯৫৮

৩। ম্যাক্সওয়েল মেডেল ও এ্যাডওয়ার্ডের প্রথম রিসিপিয়েন্ট (ফিজিক্যাল সোসাইটি, লন্ডন) ১৯৬১

৪। হিউজ মেডাল (রয়েল সোসাইটি, লন্ডন) ১৯৬৪

৫। এটমস ফর পীস মেডেল এন্ড এ্যাওয়ার্ড (এটমস ফর পীস ফাউন্ডেশন) ১৯৬৮

৬। জে, রবার্ট অপেনহাইমার মেমোরিয়াল মেডেল এন্ড প্রাইজ (মায়ামী বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৭১।

৭। হুথরী মেডেল এন্ড প্রাইজ ১৯৭৬

৮। ম্যাটিউচি মেডেল (একাডেমিয়া ন্যাজনাল ডি XL, রোম) ১৯৭৮

৯। জন টোরেন্স ষ্টেট মেডেল (আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স) ১৯৭৮

১০। রয়েল মেডেল (রয়েল সোসাইটি, লন্ডন) ১৯৭৮।

কর্মস্থল ঃ

১। প্রফেসর, সরকারী কলেজ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর, ১৯৫১-১৯৫৪।

২। নির্বাচিত সদস্য, সেন্টজন্স কলেজ, ক্যামব্রিজ, ১৯৫১-১৯৫৬।

৩। মেম্বার, ইনষ্টিটিউট অব এডভান্সড ষ্টাডি প্রিন্সটন, ১৯৫১।

৪। প্রভাষক, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১-১৯৫৬।

৫। প্রফেসর, তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ইমপেরিয়াল কলেজ, লন্ডন, ১৯৫৭।

৬। পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্স ত্রিয়েস্ত, ইতালি, ১৯৬৪।

৭। নির্বাচিত (প্রথম) ফেলো রয়েল সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৫৯।

৮। পাকিস্তান হতে নির্বাচিত, ফেলো রয়েল সুইডিশ একাডেমী অব সাইন্সেস, ১৯৭০।

৯। পাকিস্তান হতে নির্বাচিত, ফরেন মেম্বার, আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস এন্ড সাইন্সেস, ১৯৭১।

১০। নির্বাচিত ফরেন মেম্বার সোভিয়েত একাডেমী অব সাইন্সেস, ১৯৭১।

১১। নির্বাচিত, অনারারী ফেলো, সেন্ট জন্স

কলেজ, ক্যামব্রিজ, ১৯৭১।

১২। নির্বাচিত, ফরেন এসোসিয়েট, ইউ এস এ ন্যাশনাল একাডেমী অব সাইন্সেস, ১৯৭৯।

১৩। নির্বাচিত, ফরেন মেম্বার, একাডেমিয়া ন্যাজনাল ডি লিনচাই রোম, ১৯৭৯।

প্রকাশিত পেপার ঃ

এলিমেন্টারী পার্টিকেলসের ওপর গবেষণামূলক প্রায় দু'শটি বৈজ্ঞানিক মন্দর্ভ। পাকিস্তান ও তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান শিক্ষায় অগ্রগতির দিক নির্দেশ করে বহু গবেষণাপত্র প্রকাশ।

এমহান বিজ্ঞানী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলাম ও বিজ্ঞানের সেবায় নিয়েজিত ছিলেন।

বিজ্ঞানে অবিস্মরণীয় অবদান সমূহ ঃ

বিজ্ঞানে এ মহান সাধক যে অবদান রেখে গেছেন তার কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরছি ঃ

পদার্থ বিজ্ঞানে এলিমেন্টারী পার্টিকেলের ওপর গবেষণা। বিশেষ অবদান-টু কম্পোনেন্ট নিউট্রিনো থিয়োরী এবং প্যারিটি ভায়োলেশন ইন উইক ইন্টার‍্যাকশন। গেজ ইউনিফিকেশন অব উইক এন্ড ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টার‍্যাকশন্স, সিমেট্রি প্রপার্টিজ অব এলিমেন্টারী পার্টিকেলস, রিনর্মালাইনজেশন থিয়োরী এন্ড গেজ থিয়োরীজ, গ্রেভিটি থিয়োরী এবং পার্টিকেল ফিজিক্সে তার ভূমিকা, টু টেন্সং থিয়োরী অব গ্র্যাভিটি এন্ড ষ্ট্রং ইন্টার‍্যাকশন ফিজিক্স। ১৯৭৩ সালে ব্যবহারিক প্রমাণের আগেই নিউট্রাল কারেন্ট ফেনোমেনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। স্থানাভাবে পূর্ণাঙ্গ বায়োডাটা দেয়া সম্ভব হলো না। [সূত্র- সাপ্তাহিক রোববার, ৫ জানুয়ারী ১৯৮১]

তিনি সাধারণত: কুরআন করিমের আয়াত পাঠের মধ্য দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তবে নোবেল প্রাইজ গ্রহণকালে তিনি কুরআন করীমের সূরা মূলক এর ২, ৪ ও ৫ নং আয়াত বার বার পাঠ করেন। পঠিত আয়াত সমূহের অর্থ হল **"তিনি সব বিষয়ে সম্যক ক্ষমতাবান যিনি সৃষ্টি করে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করেছেন মহাশুণ্য সপ্তাকাশ, এই করুনাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত খুঁজে পাবেনা, অনুসন্ধান করে দেখ কোন ত্রুটি খুঁজে পাও কি-না, আবার দেখ বার বার নিরীক্ষণ কর, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমারই কাছে ফিরে আসবে"**।

এটিই একজন বিশ্বখ্যাত নিবেদিত প্রাণ বৈজ্ঞানিকের যুগ-যুগ ব্যাপী সাধনাপ্রসূত উপলব্ধির ফল। যিনি আজীবন এ সত্যটিকে নিয়েই সাধনা করে গেছেন। এ মহান মুসলিম বৈজ্ঞানিকের গৌরবময় কৃতিত্বকে তৃতীয় বিশ্বের সকল শ্রেণীর জনতা বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমান সহ বিশ্বের সকল মুসলিম জনতা স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। যার উদ্ধৃতি দিতে গেলে এ কলেবরে আদৌ সম্ভব হবেনা।

পরিশেষে, লেখার কলেবর বৃদ্ধি না করে বর্তমান ঝঞ্জা-বিক্ষুদ্ধ বিশ্বে ধর্ম আর বিজ্ঞানের যে ব্যবধান তা পরিহার করে সকল ধার্মিককে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে ধারণ করে দাজ্জালীয় ফেৎনার কবল হতে বিশ্বের শান্তিকামি মানুষকে উদ্ধার করার ও বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক সালাম সাহেবের একটি বক্তব্যের অংবিশেষ উদ্ধৃতি দিয়ে লেখাটি শেষ করছি।

বক্তৃতাটি ১৯৮৪ সালের ২৭ শে এপ্রিল প্যারিসের ইউনেস্কো হাউজে দেয়া হয়েছিল, বক্তৃতায় তিনি পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞানের যে সামঞ্জস্য এ সত্যটিকে অকাট্য প্রমাণ যুক্তি দিয়ে সাব্যস্ত করে দিয়েছিলেন। বক্তৃতাটির শেষাংশই এখানে উদ্ধৃতি করছি।

"পরিশেষে দু'টি চিন্তা ধারার উল্লেখের মাধ্যমে আমার এই বক্তব্যের উপসংহার টানবো, এর একটি হচ্ছে জানার আগ্রহ সম্বন্ধীয়। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পবিত্র কুরআন এবং রসুলে করীম (সা.)-এর বাণীগুলোতেই অত্যান্ত জোর দিয়ে 'শৈশাবস্থা থেকে কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত' একজন মুমেনকে জ্ঞানের অন্বেষনে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এখানে আল বেরুনীয় কথা বলছি, যিনি এক হাজার বছর আগে দক্ষিণ আফগানিস্তানের গজনীতে জ্ঞানের পথ বিকশিত করেছিলেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার সমসাময়িকদের একজন এই গল্পটি বলেছেন, 'আমি শুনতে পেলাম, আল-বেরুনী মৃত্যু শয্যায়, তাই যথাশীগ্রই আমি তাকে শেষ দেখা দেখতে তার বাড়ী গেলাম। আমাকে দেখে তার বাড়ীর একজন বললো, তিনি বেশী দিন বাঁচবেননা। যখন আমার আগমন বার্তা তারা তাকে বললেন তখন তিনি চোখ মেলে চাইলেন এবং বললেন তুমি কি অমুক? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন আমি শুনেছিলাম যে তুমি আমাদের ধর্মের উত্তরাধিকার আইনের একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান চাও এবং তিনি চির-পরিচিত একটি ধাঁ ধাঁ আওড়ালেন। আমি বললাম আবু রায়হান এই সময়ে তার কি প্রয়োজন? এর জবাবে আল বেরুনী বললেন, "তুমি কি মনে করোনা যে মুর্খ হয়ে মরার চেয়ে, জেনে, জ্ঞানী হয়ে মরা উত্তম? তার সেই কথায় আমি খুবই ব্যথিত হয়ে তাকে বললাম যে আমি তা জানি। অতঃপর আমি তার কাছ হতে বিদায় নিয়ে তার বাড়ীর সীমানা যখন অতিক্রম করছিলাম তখন বাড়ী হতে কান্নার রোল ভেসে এলো। আল বেরুনী মারা গেলেন"।

এবারে শেষ চিন্তাধারাটি পবিত্র গ্রন্থ হতে পুণঃউদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। যা মারমাদুক পিকথলের অনুবাদ গ্রন্থে এইভাবে অনুদিত হয়েছে "Movemen to tears and ecstacy " অর্থাৎ- হে আদম সন্তানেরা চোখের জলে আর পরামান্দ লাভের আশায় বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে যাও। নচেৎ শাশ্বত বিস্ময় সমৃদ্ধ এই কথার অধিক আমি কিইবা জানতে পারি। আমার জানা সকল বিজ্ঞানের মাঝে ব্যক্তিগতভাবে আমি একটিই উপলব্ধি করছি।

"পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর গুণাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী"।

২৯ শে জানুয়ারী ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের জং শহরে যে জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, দীর্ঘ ৭০ বছর ব্যাপী বিশ্বের প্রায় চল্লিশটির অধিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রী লাভকারী একমাত্র ধার্মিক মহান বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম ২১ নভেম্বর ১৯৯৬ সালে তাঁর মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে চিরশান্তির আশ্রয়ে চলে গেলেন। এ মহান বিজ্ঞানীর চিন্তা ও চেতনার পথ ধরে যদি বর্তমান বিশ্ব এগিয়ে যায় তবে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিবাদ থাকবেনা। আসুন, আমরা এ মহান সাধকের আদর্শকে ধারণ করে এগিয়ে চলি। তবেই ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীদের জন্য আবাদযোগ্য প্রকৃত শান্তিময় এক পৃথিবী কায়েম করা সম্ভব হবে।

E-mail : nesarahmed007@yahoo.com

সংবাদ

মিরপুর-এ "সিরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা" আয়োজিত

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৬ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর এর উদ্যোগে "সিরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা" মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত মীরপুর এর সম্মানীত আমীর জনাব বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী । "হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর পরমত সহিষ্ণুতা" বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মওলানা সোলায়মান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। অনুষ্ঠানে আগত অ-আহমদী মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে ২৪০ জন অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ১৬ জন বয়াত গ্রহন করেন। সভায় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও মেহমানসহ ৬৪৭ জন অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসার শেষ হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সকলের জন্য রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

-আবু জাকির আহমদ, যয়ীমে আলা,
মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর

কৃষ্ণনগর জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ সকাল ১০ টা হতে ১.৫০ মিনিট পর্যন্ত কৃষ্ণনগর জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহতী জলসায় সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ইমতিয়াজ আলী সাহেব। বিশেষ প্রতিনিধি এবং প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন, মাওলানা সোলায়মান সাহেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন আল আমীন মোয়াল্লেম সাহেব। নযম পাঠ করেন কাইয়ুম হাওলাদার (কায়েদ পটুয়াখালী জামাত) আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতিমূলক লিফলেট পাঠ করে শুনান মওলানা জুনায়েদ ইসলাম, বড় বাইশদিয়া জামাত। বক্তৃতা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব নওশাদ আহমদ, মুরুব্বী পটুয়াখালী জামাত, মাওলানা সোলায়মান সুমন। প্রেসিডেন্ট আলী আহমদ মাষ্টার এবং ইমতিয়াজ আলী সাহেব। স্থানীয় ৮০ জন এবং ৩৫ জন অ-আহমদী ভাই ও বোনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা সোলায়মান সাহেব। সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

নওশাদ আহমদ

বীরগঞ্জ জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১১/১১/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ নুরুন্নবী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম (মোয়াল্লেম)। জনাব এম,এ, আনসারী (অব. মোয়াল্লেম)। এরপর সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

ডোহান্ডা জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১১/১১/২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ডোহান্ডাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আফতাব উদ্দীন সাহেব, কুরআন পাঠ করেন জনাব শামীম আহমদ মোয়াল্লেম, নযম পাঠ করেন জনাব সালেহ আহমদ সুমন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত অনুষ্ঠান বাদ আছর হতে এশা পর্যন্ত চলে। এ অনুষ্ঠানে মোট ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শামীম আহমদ

ফাজিলপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/১১/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ জনাব রেজেয়ানুল হক খাঁন সাহেবের সভাপতিত্বে এবং নূর এলাহী জসিম সাহেব এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সীরতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয় নবী (সা.)-এর বাল্য জীবন নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মনসুর আহমদ। প্রিয় নবীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

এরপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। জামাতের প্রায় সকল সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

গাজীপুর জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুর এর উদ্যোগে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বা জুমুআ হতে মাগরিব পর্যন্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও নও মোবাইন ও জেরে তবলীগ এর অনুষ্ঠান করা হয়, জনাব আতিকুর রহমান সাহেব এর সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়, কুরআন তিলাওয়াত ও নযম এর পর বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মাহমুদ বাবু, জনাব কবির আহমদ এবং মৌ. কামরুল ইসলাম প্রধান সাহেব। এরপর আমি কেন আহমদী হলাম এ বিষয়ের ওপর নওমোবাইন ভাইগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর সভাপতি সাহেব তার ভাষণ প্রদান করে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন। মোট ১০৮ জন সদস্য/সদস্যা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কামরুল ইসলাম প্রধান

তেরগাতীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৯/১১/২০১৬ তারিখ বাদ মাগরীব হতে ৬টা পর্যন্ত তেরগাতীর জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। উর্দু নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ মাসরূর আহমদ উৎস।

বক্তৃতা পর্বে বক্তৃতা করেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিবেশীর সাথে আচরণ' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি মানবের আনুগত্য' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়ত' এ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব তুষার আহমদ।

এরপর 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কী জীবন' এ বিষয়ে আলোকপাত করেন জনাব নূরুল ইসলাম। 'বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক মহানবী (সা.)' এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল বক্তৃতা করেন জনাব জনাব মাওলানা নাবিদ আহমদ, সদর মুরব্বী তেরগাতী জামাত, এরপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে জেরে তবলীগসহ ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

দোয়ার আবেদন

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখ থেকে সারা দেশে এস. এস. সি পরীক্ষা শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ্। এতে সারা বাংলাদেশের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিবেন। তারা যেন পরীক্ষা শুরুর আগ পর্যন্ত যে সময়টুকু থাকে তাতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে, সুস্থ থেকে, শৃঙ্খলতা অবলম্বন করে ও দুর্ঘটনা এড়িয়ে ভাল পরীক্ষা দিতে পারেন, এ জন্য পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার প্রকাশকের পক্ষ থেকে সকল আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

–প্রকাশক

কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকের ওপর পরীক্ষা গ্রহণ

গত ১৫/০৯/২০১৬ তারিখ কেন্দ্রের নির্দেশে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুর-এর উদ্যোগে কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকের ওপর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এরপর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

উত্তর বঙ্গের ভাতগাঁও মজলিস সফর প্রসঙ্গ

গত ১৫-১১-২০১৬ইং থেকে ২১-১১-২০১৬ইং পর্যন্ত পেশাগত কারণে মোহতরম সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর নির্দেশক্রমে উত্তরবঙ্গের ভাতগাঁও মজলিস/জামাত সফর করি। গত ১৮-১১-২০১৬ ইং তারিখের সকালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, রংপুর রিজিওনের কর্মশালা পরিচালনা করি। জুমুআর নামাযের পর খাকসারের সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও এ সিরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৫২ জন স্থানীয় আহমদী ভাই-বোন অংশগ্রহণ করে। এই প্রোগ্রামে কোন জেরে তবলীগ অংশগ্রহণ করেন নি। খাকসার জেরে তবলীগ অনুপস্থিত থাকার কারণ অনুসন্ধান করে বুঝতে পারি যে পরিকল্পনার অভাবে এমনটি হয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় সকলকে পরিকল্পিত ভাবে এই ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার আহ্বান জানাই যেখানে অবশ্যই জেরে তবলীগ উপস্থিত থাকবে। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী জলসা শেষ হয়। পরে আবারো কর্মশালা শুরু হয় যা মাগরিব নামাযের পূর্বে সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ ইউনুস আলী

বগুড়া জামাতের কবরস্থানে ওয়াকারে আমল কর্মসূচী পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়ার উদ্যোগে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম হিসেবে কৈগাড়ী, বগুড়ার কবরস্থানে (জামাতের কবরস্থানে) গত ০২/১২/২০১৬ তারিখ শুক্রবার সকাল ৭ টা হতে বেলা ১১টা পর্যন্ত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব জোবায়ের আহমেদ এর তত্ত্বাবধানে ওয়াকারে আমল কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। উক্ত প্রোগ্রামে মৃত ব্যক্তিদের কবরগুলোর জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছে এবং তার আশ-পাশে রাস্তার মত তৈরী করা হয়েছে, যাতে করে যে কোন পরিদর্শনকারী বুযূর্গব্যক্তিগণের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করতে পারেন। এই কর্মসূচিতে মোট ২২ জন অংশগ্রহণ করেন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রেসিডেন্ট

জামালপুর (নয়াপাড়া) জামাতে স্থানীয় নও-মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ১৮ই নভেম্বর, ২০১৬ শুক্রবার জামালপুর (নয়াপাড়া) জামাতের উদ্যোগে ১দিন ব্যাপি নও-মোবাঈনের তালীম তরবিয়তী ক্লাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত ক্লাস সকাল ১০.৪৫ মি. শুরু হয়ে বিকাল ৩.টা পর্যন্ত চলে। উক্ত ক্লাসের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ছলিমউল্যাহ সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নও-মোবাঈনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জনাব আবু জাকির আহমদ সাহেব। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত একজন নও-মোবাঈন আতফাল। নও-মোবাঈনের ক্লাস পরিচালনা করেন জনাব আবু জাকির আহমদ সাহেব। নও-মোবাঈনের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মুরুব্বী সিলসিলা, জামালপুর উত্তর অঞ্চল। এরপরে নও-মোবাঈনের কাছে তাদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনা হয় এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। উক্ত ক্লাসে ৫০ জন নও-মোবাঈন ও ১০ জন যেরে তবলীগ সহ মোট উপস্থিত সংখ্যা ১০৫ জন। আগত মেহমানদের মধ্য থেকে ৭ জন ভাই বোন বয়আত গ্রহণ করেন।

-আবু জাকির আহমদ
এডিশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও
ওয়াকফে জাদীদ নও-মোবাঈন

১৫+ ওয়াকেফাতে নও-এর বিশেষ ক্লাসের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ৪ নভেম্বর শুক্রবার বাদ্ জুমুআ ১৫+ ওয়াকেফাত নওদের এক বছরব্যাপী বিশেষ ক্লাসের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৫ জন ওয়াকেফাতে নও ও ১২ জন মা উপস্থিত ছিলেন। যেসব মজলিস অংশগ্রহণ করে: ঢাকা, মিরপুর, তেজগাঁও ও মাদারটেক। ক্লাসে যেসব বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করা হয়।

– বিশেষ ক্লাসের উদ্দেশ্য কি ছিল?

– সারা বছরব্যাপী ওয়াকেফাতে নওদের প্রতি দেয়া হুযূর (আই.)-এর নির্দেশাবলী।

– একজন ওয়াকফাতে নও মায়ের করণীয়

– ওয়াকেফাতে নওদের প্রতি সদর সদর সাহেবার নির্দেশনা

– এই ক্লাস থেকে কি শিখলাম?

সবশেষে কুরআন তিলাওয়াত, লিখিত, উপস্থিতির অনুবাদ কাজের জন্য ওয়াকেফাতে নওদের হাতে সদর সাহেবা পুরস্কার তুলে দেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। আল্লাহ্ আপনার হাফেয, নাসের ও হাদী হোন।

রওশন জাহান

সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ

তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেট-এর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায় বাদ জুমুআ জনাব মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে একটি তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তানভির আহমদ। এরপর তরবিয়তী বিষয়ে আনসারদের দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন এ.এস.এম ফরিদ, যয়ীম সিলেট। জামাতের বার্ষিক উন্নতি ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তৃতা দেন জনাব শরিফুল হক, জেনারেল সেক্রেটারী সিলেট। জনাব বদরুল ইসলাম সাহেব বলেন, আমাদের সবাইকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত রুটিন ও সিলেবাস মোতাবেক পড়াশুনা বৃদ্ধি করা উচিত। সেক্রেটারী তরবিয়ত জনাব ইকবাল হোসেন সাহেব বলেন প্রত্যেকের দুর্বলতা দূর করে আরো বেশী মনোযোগী হতে হবে জামাতের সকল কাজে। সবশেষে খাকসার হুযূর (আই.)-এর খুতবার আলোকে এবং শূরার প্রস্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনা করি। বিশেষ করে নামায আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, পাঠচক্র করা, নিয়মিত এম.টি.এ দেখা ইত্যাদি। পরিশেষে সভাপতি সাহেব সবাই খেলাফতের প্রতি আনুগত্য ও জামাতের কাজে বেশী বেশী অংশগ্রহণের প্রতি জোর দেন। এরপর খাকসার ইজতেমায়ী দোয়া পড়াই ও অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করি।

মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক "আহমদী" পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর উদ্যোগে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১১/২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলীর উদ্যোগে ১টি তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাকসার সেলিনা আকতার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন তিলাওয়াত করেন আমাতুল হাফিজ সীতি। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে' 'ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন। আমাদের ধর্মবিশ্বাস। 'ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব' 'খাতামান নাবীঈন' ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে তবলীগি টিম ও আমেলার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আলোচনায় নেয়। জেরে তবলীগ ও গয়ের আহমদী অন্যান্য মেহমানগণ বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করেন। উল্লেখ্য যে, জনাব জাহিদুল ইসলাম শুভ মুরুব্বী সিলসিলাহ কুরআন ও হাদীসের আলোকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ স্বরূপ প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাজনাদেরকে সহযোগিতা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত সেমিনারে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোছাঃ সেলিনা আকতার

দারুত তবলীগ মসজিদে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ শুক্রবার বেলা ২.৩০ মিনিটে দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সেমিনারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মোহাম্মদ নাজির আহমদ, শফিকুল হাকীম যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন মোহতরম হাফেজ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সাহেব। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব, সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম "আখেরী জামানা" পরিবেশন করেন মোহতরম এস এম রহমতউল্লাহ।

সভায় শ্রোতা মন্ডলীর উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি ও ধর্ম বিশ্বাসের ওপর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন মোহতরম মাওলানা সোলাইমান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মোবাল্লেগ ইনচার্জ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন, পুরুষ ও মহিলা জেরে তবলীগ মেহমানদের প্রশ্নেরও দাললিক যুক্তিপ্রমাণ সহ প্রাণবন্ত উত্তর প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ৫৪৪ জন সদস্য উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের তৌফিক অর্জন করেন, আলহামদুলিল্লাহ। উল্লেখ্য, ৩১১ জন মেহমানদের মধ্য হতে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রায় পুরুষ ৬০ জন ও মহিলা ১০ জনসহ মোট ৭০ জন মেহমানদেরকে তালিকাভুক্ত করা যায়নি।

অনুষ্ঠানে প্রত্যেক আনসারকে ব্যক্তিগত ভাবে ১০ জন মেহমানদেরকে দাওয়াত ও তবলীগ করতে টার্গেট দেওয়া হয় ফলে উক্ত লক্ষ্য পূরণে এ পর্যন্ত ২২০ জন আনসার দোয়ার মাধ্যমে প্রায় ১০০০ জন নতুন পুরাতন মেহমানদের দাওয়াত ও তবলীগ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতার জন্য হুযূর (আই.)-এর নিকট ২টি পত্র প্রেরণ করা হয় এবং কিছু আনসার, লাজনা সদস্যারা তাহাজ্জুদ আদায়, নফল রোযা পালন ও সদকা প্রদানের মাধ্যমেও তবলিগী সেমিনারের সফলতা কামনা করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে বন্ধুদের জন্য ঈমানবর্ধক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও দুপুরের খাবার বিকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ২০০ টি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি লিফলেট, ২০০ টি নামায শিক্ষা পুস্তক আগত অতিথিদের মাঝে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান মাগরিবের আগে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য, মাগরিবের নামায শেষে আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের মধ্য হতে ২ জন সৌভাগ্যবান ভ্রাতা পবিত্র বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

শফিকুল হাকিম আহমদ, যয়ীমে আলা

হিফযুল ক্লাসের ছাত্রদেরকে নিয়ে হাতিরঝিল ভ্রমণ

গত ২৬/১১/২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৩ টায় হিফযুল ক্লাসের ছাত্রদেরকে জামাতের গাড়ি নিয়ে খাকসার হাতিরঝিলে বেড়াতে যাই। এই ভ্রমণে যারা ছিলেন তারা হলেন– হিফয ক্লাসের শিক্ষক জনাব হাফেয মোহাম্মদ আজিজুর রহমান খান এবং সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর), মোয়াল্লেম জাহাঙ্গীর আলম (বুলু) এবং বাবুর্চি জনাব শহীদুল ইসলাম লেন্দু এবং হিফযুল কুরআন ক্লাসের ১২ জন ছাত্র ছিল। সেখানকার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করি এবং বিভিন্ন স্থানের ছবি নেই। আমরা সেখানে তাদের কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত ও নযম শুনি। এরপর তাদেরকে বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভমূলক গল্পও শুনাই। অতঃপর সন্ধ্যা ৬টার দিকে গাড়ি দিয়ে পুরো হাতিরঝিল এলাকায় রাতের দৃশ্য অবলোকন করি। রাত ৭টা ১৫ মিনিটে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটি রেষ্টুরেন্টে রাতের খাবার খাই। রাত ৮ টায় আমরা বকশীবাজারে ফিরে আসি।

জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর)
সহকারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত

(সম্পাদকীয়-র বাকী অংশ)

এ প্রেক্ষাপটে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) মসজিদ বায়তুল ফুতুহ-তে প্রদত্ত জুমআর খুতবায় রবিউল আউয়াল মাসের মাহাত্ম এবং চাকওয়ালের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, 'পরিতাপের বিষয় হল, মুসলমানদের বৃহৎ অংশ যদিও মানবতার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী মহানবী (সা.) এর জন্মদিন ঘটা করে উদযাপন করে, তথাপি তাদের নিজেদের অবস্থা হল ***'কুলুবুহুম শাত্তা'*** অর্থাৎ তাদের নিজেদের হৃদয় পরস্পর শতধাবিভক্ত। যেভাবে কুরআনে মুসলমানদের পরিচয় বলা হয়েছে যে তারা ***'রুহামাউ বায়নাহুম'*** অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র– সেরকম তো তারা নয়ই, বরং তারা আজ পরস্পরের রক্তপিপাসু। প্রতিদিন তাদের হাতে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ও রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে শত-শত মুসলিম নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, জেনেশুনে একজন মুসলমানকেও হত্যা করার শাস্তি হল জাহান্নাম। কোন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করলেও তোমরা জাহান্নামে যাবে। ইসলামকে তারা এতটা দুর্নাম করেছে যে কারণে আজ অমুসলিম বিশ্ব ইসলামের নাম শুনলেই তাদের মনে যে চিত্র ভেসে ওঠে তা হল অত্যাচার ও বর্বরতা। তবে একটি বিষয়ে এসব নামধারী মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও উলামারা একমত ও একজোট এবং তা হল, আল্লাহ ও রসূল (সা.)-এর একটি নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, মুসলমানরা যখন পরস্পর শতধাবিভক্ত হয়ে একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, উলামাদের অবস্থাও এতটা খারাপ হবে যে আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হবে তারা এবং তারা লড়াই-ঝগড়ার উৎস হবে– সেই সময় প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আগমন করবেন এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সামনে ইসলামের প্রকৃত ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করে পুরো বিশ্বকে এক উম্মতে পরিণত করার কাজ করবেন। আজ উলামারা এই বিষয়টিকেই অস্বীকার করছে। শুধু তা-ই নয়, বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে মিথ্যা বলে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যে উস্কে দিচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে তাদের।

হুযুর (আই.) পাকিস্তানের দুলমিয়ালে মিলাদুন্নবীর মিছিল থেকে আহমদীদের মসজিদে হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, আহমদীরা তো মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল; কিন্তু পুলিশ আহমদীদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দরজা খুলিয়েছে এবং এরপর মসজিদকে অরক্ষিত ছেড়ে দিয়েছে, যার পরিণামে হামলাকারীরা মসজিদের জিনিসপত্র বের করে এনে অগ্নিসংযোগ করে। হুযূর বলেন, আহমদীরা তো কলেমার জন্য, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও মহানবী (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত, জাগতিক ক্ষয়-ক্ষতি কোন বিষয় নয়। এদের মিলাদ পালন তো কেবল প্রথাগত আচার এবং আহমদীদেরকে গালিগালাজ করা যেটিকে তারা ইসলাম-সেবা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত সেবার দায়িত্ব তো আহমদীরা পালন করছে আর এই দায়িত্ব তখন থেকে পালন করে আসছে যখন থেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দাবি করেন আর বলেন যে 'প্রকৃত একত্ববাদ ও মহানবী (সা.) এর সম্মান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য আমি এসেছি।'

খুতবার শেষদিকে এসে হুযূর (আই.) দোয়া করেন, আমরা যেন শত্রুর প্রতিটি আক্রমণ ও অত্যাচারের পর পূর্বের তুলনায় আরও বেশি নিজেদেরকে ঈমানে সমৃদ্ধ করতে থাকি এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি আরও বেশি বেশি দরূদশরীফ পাঠ করতে থাকি, যেন 'মুসলমান' দাবীকারি প্রত্যেকেরই মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদার জ্ঞান লাভ হয় আর বিকৃতির শিকার মুসলমানরা যেন সঠিক পথে ফিরে আসে এবং বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটে।

আল্লাহ্ তা'লা এসব উগ্রধর্মান্ধদের হাত থেকে পাকিস্তানসহ সমগ্র বিশ্বের মানুষকে নিরাপদ রাখুন এ কামনাই আমাদের থাকবে। পাঠকবৃন্দকে আবারও জানাই বিজয়ের শুভেচ্ছা ও মহানবী (সা.)-এর মহান আদর্শ অবলম্বন করার উদাত্ত আহবান।

সোনটিয়া জামাতে স্থানীয় নও-মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে গত ১৮ই নভেম্বর, ২০১৬ শুক্রবার সোনটিয়া জামাতের উদ্যোগে ১দিন ব্যাপি নও-মোবাঈনদের তালীম তরবিয়তী ক্লাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। বেলা ১২টা হতে শুরু হয়ে বিকাল ৩টা ক্লাস পর্যন্ত চলে। উক্ত ক্লাসের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আফসার আলী সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামালপুর অঞ্চলের জেনারেল ইনচার্য মাওলানা রবিউল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল্যাহ সবুজ এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম সেলিম আহমদ সাহেব। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন একজন নও-মোবাঈন ভাই জনাব মাসুদ আহমেদ। নও-মোবাঈনের দায়িত্ব কর্তব্য কি -এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম।

এরপরে নও-মোবাঈনের কাছে তাদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনা হয় এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। উক্ত ক্লাসে মোট উপস্থিত সংখ্যা ৮০ জন। এর মধ্যে নও-মোবাঈনের সংখ্যা ৩৮ জন, মেহমান ৭জন এবং বাকী সবাই পুরানো আহমদী।

-মাওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম
মুরুব্বী সিলসিলা, জামালপুর উত্তর অঞ্চল

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর এর ১০ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৬ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে গত ১ ও ২ ডিসেম্বর, ২০১৬ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর-এর ১০ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সম্মানিত প্রতিনিধি আলহাজ্জ নাজির আহমদ সাহেব এর সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার, ১ ডিসেম্বর বাদ মাগরিব ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আবুল খায়ের এবং নযম পাঠ করেন এনামুল হক রাসেল। উদ্বোধনী অধিবেশনে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন স্থানীয় যয়ীমে আলা, আবু জাকির আহমদ। 'কিভাবে আপনি একজন আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হবেন' এবং 'ইসলাম আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে একজন আহমদী সদস্যের মান কিরুপ হওয়া উচিত' এ বিষয়ে উক্ত সভায় নসিহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা সোলায়মান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। নসীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুর-এর সম্মানিত আমীর বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী সাহেব। তরবীয়তী সভায় স্থানীয় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও মেহমানসহ ২২০ জন অংশগ্রহন করেন।

কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যবৃন্দ, ঢাকা জেলা ও রিজিওনাল নাযেম আলা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ইজতেমায় যোগদান করেন। ইজতেমার হাজিরা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি আনসার সদস্যদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও ইজতেমার সিলেবাস ও অনুষ্ঠানসুচি ফটোকপি করে সদস্যদের নিকট পৌঁছানো হয়েছে। ইজতেমায় অংশগ্রহনের জন্যে নও মোবাইনদের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে অংশগ্রহনকারী ১৫ জন নও-মোবাঈনকে পুরষ্কৃত করা হয়। ২৫ জন আনসার সদস্য বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন। সমাপনী অধিবেশনে মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুরের বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৬ পেশ করেন মোস্তাযীম উমূমী রফিকুল ইসলাম। ইজতেমায় তালিমী ও খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ইজতেমায় ১০০ জন স্থানীয় আনসার সদস্য ও কিছু সংখ্যক মেহমান অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তবলীগ, তরবিয়ত নও-মোবাঈন ও ইশার বিভাগের উত্তম কর্মীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৬ শ্রেষ্ট ও উত্তম হালকা সমূহের নাম ঘোষণা করা হয়। কাজীপাড়া হালকার যয়ীম তালহা শের আলীর হাতে শ্রেষ্ঠ হালকার ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও আহমদনগর ও মোকামী হালকাকে উত্তম হালকা ঘোষণা করা হয় ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার পর সভাপতি সাহেব ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

-মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
আহবায়ক-স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৬

Bangla Shomprochar Schedule, December 2016

এমটিএ-তে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ডিসেম্বর মাসের সময়সূচী

Date	Day	URDV	Description/Remarks
01/12/2016	Thursday	**Repeat**	Friday Sermon of Previous Week
02/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
03/12/2016	Saturday	REPEAT 726	13th Episode of Bornali, a Magazine Programe by Lajna members of Bangladesh.
04/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
05/12/2016	Monday	**REPEAT 727**	6th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
06/12/2016	Tuesday	**729**	28th Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
07/12/2016	Wednesday	**REPEAT 645**	8th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 8th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
08/12/2016	Thursday	**Repeat**	Friday Sermon of Previous Week
09/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
10/12/2016	Saturday	**730**	14th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.
11/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
12/12/2016	Monday	**731**	7th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
13/12/2016	Tuesday	**732**	29th Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
14/12/2016	Wednesday	**REPEAT 647**	9th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 9th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
15/12/2016	Thursday	**Repeat**	Friday Sermon of Previous Week
16/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
17/12/2016	Saturday	**733**	15th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.

Date	Day	URDV	Description/Remarks
18/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
19/12/2016	Monday	REPEAT 723	5th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
20/12/2016	Tuesday	734	30th Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
21/12/2016	Wednesday	REPEAT 650	10th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 10th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
22/12/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
23/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
24/12/2016	Saturday	REPEAT 730	14th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.
25/12/2016	Sunday	-------	Central Bangla Desk's program
26/12/2016	Monday	735	8th Episode of Halchal, a Magazine programe by Khuddam members of Bangladesh.
27/12/2016	Tuesday	736	31st Episode of Deeni o Fiqahi Masail, Jalsa Speech 2016
28/12/2016	Wednesday	REPEAT 653	11th Episode of Ruhani Khazain, a discussion progame on the book the promised Messiah (as) 11th Episode of Muhammad (Saw) Jalsa Speech 2015.
29/12/2016	Thursday	Repeat	Friday Sermon of Previous Week
30/12/2016	Friday	-------	Central Bangla Desk's program
31/12/2016	Saturday	REPEAT 733	15th Episode of Bornali, a Magazine programe by Lajna members of Bangladesh.

Wassalam

21/10/2016

MOHAMMAD KHAIRUL HAQ
In-charge, MTA Bangla.

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 79 | 11 & 12th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st December, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com